দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

দাড়িভিটের ঘটনার
সি বি আই তদন্ত
দরকার — পৃঃ ১১

তর্পণ মূলত
শিকড়ের সন্ধান
—পৃঃ ৩১

৭১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ৮ অক্টোবর ২০১৮।। ২১ আশ্বিন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিত্যমেব নমোনমঃ ।।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ২১ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৮ অক্টোবর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18
R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
তৃণমূলিদের বিরুদ্ধে জনরোষ দ্রুত বাড়ছে
□ গূঢ়পুরুষ □ ৬
বিচ্ছিন্ন শ্রীভূমি শ্রীহট্ট □ জওহরলাল পাল □ ৭
প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর জুড়ি মেলা ভার
□ অমিত শাহ □ ৮
দাড়িভিটের ঘটনার সি বি আই তদন্ত দরকার
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১১
আজাদ হিন্দ সরকারের প্লাটিনাম জয়ন্তী ও নেতাজী সুভাষ
□ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ১৩
রাষ্ট্রায় স্বাহা □ বিজয় আঢ্য □ ১৯
অবনীন্দ্র-শিষ্য রেবতীভূষণ □ শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী □ ২১
মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন গোপালচন্দ্র সেন
□ জিষ্ণু বসু □ ২২
আমার সুপ্রিয়া-তর্পণ □ লকেট চট্টোপাধ্যায় □ ২৩
আমার দ্রোণাচার্য গোষ্ঠ পাল □ কল্যাণ চৌবে □ ২৪
স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দিনের সম্পাদক সত্যেন মজুমদার □ অভিজিৎ দাশগুপ্ত □ ২৫
গুরু কেলুচরণ একাধারে আমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর
□ অলকা কানুনগো □ ২৬
আমার লেখক জীবনের পথপ্রদর্শক রমাপদ চৌধুরী
□ রমানাথ রায় □ ২৭
পিতাকে রোজই তর্পণ করি □ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় □ ২৮
তর্পণ মূলত শিকড়ের সন্ধান □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১
শক্তিরূপেন সংস্থিতা □ কৃষ্ণচন্দ্র দে □ ৩৩
গল্প : জবাকুসুম □ বারিদবরণ বিশ্বাস □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৬-১৭** □ **সুস্বাস্থ্য: ১৮** □
□ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **অঙ্গনা : ৪০** □ **রঙ্গম : ৪১** □
অন্যরকম : ৪২ □ **স্মরণে : ৪৩-৪৫**
□ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

প্রকাশিত হবে ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দুর্গতিনাশিনী

পুজোর আর দেরি নেই। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই মা আসবেন। মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বিশ্বপ্রকৃতি। সারা বছরের পাওয়া না-পাওয়া, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভুলে সকলেই ভেসে যাবে এক অনাবিল আনন্দতরঙ্গে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় দুর্গাপুজো এবং পুজোকে কেন্দ্র করে বাঙালির নানা স্তরের জীবনচর্যা। লিখবেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তর্পণ ভারতীয় পরম্পরায় বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

তর্পণ। তর্পণ অর্থে অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন। তর্পণ অর্থে ঋণ স্বীকারও। পিতৃপক্ষের শেষ দিনটিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ হিন্দু সমাজের এক অতীব প্রাচীন রীতি। বংশ পরম্পরায়, প্রজন্মের পর প্রজন্মে এই রীতিটি আজও পালিত হইয়া আসিতেছে। তর্পণের একটি তাৎপর্য রহিয়াছে। তর্পণ অর্থে একদিন, একটি বিশেষ তিথিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা নয়। তর্পণের তাৎপর্য আরও গভীর। সেই তাৎপর্যটিকে অনুধাবন না করিয়া, যদি নিয়মমাফিক কিছু প্রথা পালন করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকৃত তর্পণ হইবে না। পিতৃপক্ষের শেষ দিনটিতে যখন আমরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিব— তখন তর্পণের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। এই তর্পণ রীতিটির ভিতর হিন্দু দর্শনের প্রকৃত ভাবটি লুক্কায়িত রহিয়াছে। হিন্দু দর্শন কখনো কাহাকেও ঘৃণা করিতে শিখায় নাই। সমগ্র বিশ্বের প্রাণী ও জড়জগতের কল্যাণ কামনাই হিন্দু দর্শনে বিধৃত হইয়াছে। 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'—হিন্দু দর্শনেই এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে। তর্পণের ভিতর দিয়া এই প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই পৃথিবীতে আমরা সর্বাপেক্ষা ঋণী পিতা-মাতার প্রতি। তাঁহারা আমাদের পৃথিবীর আলো দেখাইয়াছেন। জীবনের নানাবিধ দুঃখকষ্ট, ঝড়ঝঞ্ঝা হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়া, তাঁহারা আমাদের প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধায় অবনত হইব, যে অপরিশোধ্য ঋণ তাঁহাদের প্রতি আমাদের তাহা স্মরণ করিব—তর্পণ এই শিক্ষাই আমাদের দিতেছে। বর্তমানকালে তর্পণের এই শিক্ষাটি আরও বেশি জরুরি এই কারণেই যে, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের কোথায় যেন ঘাটতি পড়িতেছে। ইদানীং সংবাদপত্র খুলিলেই পিতা-মাতার উপর সন্তানের অত্যাচারের সংবাদ নজর কাড়ে। পতনোন্মুখ এই সমাজে তাই তর্পণের তাৎপর্য অনুধাবন করা সবিশেষ জরুরি।

শুধু পিতা-মাতার প্রতি নহে। সমগ্র বিশ্বের প্রতিই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, অবনত মস্তকে শ্রদ্ধার্পণের শিক্ষাও তর্পণ দিতেছে। নিজের পিতা-মাতা ব্যতীতও, পূর্বজ শ্রদ্ধেয় জনেরা, শিক্ষক, এমনকী অনাত্মীয়ও—জীবনের চলার পথে যাঁহাদের কাছে কোনও না কোনওভাবে আমরা ঋণী, কোনও না কোনওভাবে যাঁহারা আমাদের সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশেই পিতৃপক্ষের এই শেষ দিনটিতে তর্পণের রীতি রহিয়াছে। শুধু আত্মীয়-অনাত্মীয়ও নয়— এই অকৃপণ প্রকৃতিও প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের ঋণপাশে আবদ্ধ করিতেছে। প্রকৃতির অকৃপণ দান প্রতিটি দিবসে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করিতেছে। পিতৃপক্ষের শেষ দিনটিতে তর্পণের মাধ্যমে সেই পরমা প্রকৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি রহিয়াছে।

আর এই ভাবেই তর্পণ রীতির মাধ্যমে হিন্দু দর্শনের মূল ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভাবটি শ্রদ্ধার ভাব। স্বস্তিকার এই সংখ্যাটিতে আমরাও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিয়াছি সেইসব বিশিষ্টজনদের, যাঁহারা আমাদের জীবনকে আলোকিত করিয়াছেন, সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে। তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনম্র নমস্কার।

সুভাষিতম্

বিজেতব্যা লঙ্কা চরণতরণীয়ো জলনিধিঃ/বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যো রণভুবি সহায়শ্চ কপয়ঃ।

তথাপ্যেকো রামঃ সকলমবধীদ্ রাক্ষস কুলম্/ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।।

পদব্রজে সাগর পার করে শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র বানরদের সঙ্গে নিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ রাবণ ও রাক্ষসসেনাদের যুদ্ধে হারিয়ে লঙ্কা জয় করেন। যথেষ্ট উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও মহান লোকেরা এভাবেই কাজে সাফল্য লাভ করেন।

তৃণমূলিদের বিরুদ্ধে জনরোষ দ্রুত বাড়ছে

গূঢ় পুরুষের কলম

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনরোষ ধীরে ধীরে বাড়ছে ইসলামপুরে ছাত্রহত্যার ঘটনার প্রতিবাদ বিক্ষোভে তা স্পষ্ট। এটাও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে মমতা মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্য বা মন্ত্রী অযোগ্য অপদার্থ। তৃণমূল দলের কাউন্সিলার থেকে বিধায়ক কেউই তাঁদের এলাকার মানুষের চাহিদার খবর রাখেন না। কারণ, তাঁরা জানেন নেত্রীর জয়ধ্বনি দিলেই জনপ্রিয়তা তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। দিদির পুলিশও জানে যে 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা' থাকলে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা থেকে হাসপাতালে ডাক্তারবাবুকে অকারণে চড়থাপ্পড় মেরে দিব্যি পার পাওয়া যায়। পোস্তা থেকে মাঝেরহাটের সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা থেকে বাগড়ি মার্কেটে আগুন সর্বক্ষেত্রেই দিদি বলেন, ''কাউকে ছাড়া হবে না। কড়া শাস্তি দেওয়া হবে''। অথচ বাস্তবে দেখি কোনও অপরাধেরই শাস্তি নেই। বাগড়ি মার্কেটের আগুনে সর্বস্ব হারানো ব্যবসায়ীদের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে 'গুণ্ডা' বলেছিলেন। তারপরেও টাকা খাইয়ে বাগড়ির ব্যবসায়ীদের একাংশকে মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর ছবি কলকাতার খবরের কাগজগুলিতে ফলাও করে ছাপতে দেখেছেন রাজ্যবাসী। তবে ধন্যবাদটা কেন সেটা বোঝা গেল না। ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে ছিলেন। মার্কেটের আগুন নেভাতে দমকল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অথচ দিদি যাদের গুণ্ডা ব্যবসায়ী বলেছিলেন বিদেশে বসে, তারাই মিছিল করে দিদি আর তাঁর মন্ত্রী প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এত বড় নির্লজ্জ তোষামোদ শেষ কবে দেখেছেন বলুন তো!

তৃণমূল প্রশাসন ব্যর্থ। প্রতিদিন খবরের কাগজে ধর্ষণ, নারী লাঞ্ছনার ঘটনা চোখে পড়ছে। এছাড়া তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ, খুন তোলাবাজি বেড়েই চলেছে। শিক্ষার বেহাল অবস্থা। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার মান এখন তলানিতে। খাস কলকাতায় যদি এই অবস্থা হয় তবে জেলার পরিস্থিতি কতটা খারাপ একবার ভেবে দেখুন। উত্তর দিনাজপুরের প্রান্তিক গ্রাম দাড়িভিট বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবি ছিল উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে ভালোভাবে পড়াশুনা করার। কিন্তু স্কুল শিক্ষা দপ্তরের গড়িমসি এবং গাফিলতিতে এই সামান্য কাজটুকুও করা যায়নি। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন স্কুল পরিদর্শকরা তাঁদের এলাকায় স্কুল পরিদর্শনে যান না। প্রধান শিক্ষকদের হুকুম দেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। অযোগ্য দলীয় কর্মী সমর্থকরা শিক্ষকের নিয়োগপত্র পান। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করলেই প্রতিবাদীদের 'বিজেপি' তকমা দিয়ে খুন করার হুমকি দেয় তৃণমূল দলপতিরা। বলে, বেশি কথা বললে পিঁপড়ের মতো টিপে মেরে দেব। অবাক লাগে যখন দেখি ঠিক এই কথাই সিপিএম নেতা নেত্রীরা বড়াই করে বলতেন। বুদ্ধদেববাবুকে বলতে শুনেছি যে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে পুলিশ গুলি চালাবে। তাতে দু'চারটে লোক মরলে আমাদের কিছু যায় আসে না।

দাড়িভিট বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণকে পুলিশ কাছ থেকে গুলি করে মেরেছে। কেন? এই দুই কিশোরের অপরাধটা কী? স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীরা বলেছেন, সেদিন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে স্কুলের গেটের বাইরে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ সকলের চোখের সামনে দিনের বেলায় পুলিশ গুলি চালিয়ে দু'জন কিশোর ছাত্রকে হত্যা করে। মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্টে রাইফেলের গুলিতে রাজেশ এবং তাপস খুন হয়েছে বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের রাইফেল একমাত্র পুলিশই ব্যবহার করে। এই জোড়া খুনের তদন্ত করছে রাজ্য- পুলিশের সি আই ডি। অর্থাৎ খুনিরাই তদন্ত করছে খুনের। কথাটা আমার নয়। নিহত রাজেশের বাবা দুলাল সরকার বলেছেন, ''পুলিশ আমার ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। তাই সি আই ডি তদন্ত হলে সত্য জানা যাবে না। আমরা ওই তদন্ত মানছি না।'' মৃত ছাত্র তাপসের বাবা বাদল বর্মন বলেছেন, ''পুলিশ সত্য চাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা রাজ্য পুলিশের সি আই ডি তদন্ত মানি না।'' আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিদি অবশ্য বিদেশে বসে দু' মিনিটে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছেন। দিদির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দাড়িভিট বিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ করছিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল বিহার থেকে নিয়ে আসা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তারাই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দুই ছাত্রের বুকে লাগে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন তদন্ত রিপোর্ট টুইটারে বলে দিয়েছেন তখন সি আই ডি তদন্ত ভিন্ন হতে পারে না। বুদ্ধদেববাবুর আমলেও দেখেছি নন্দীগ্রামকাণ্ডে পুলিশের গুলিতে মৃত গ্রামবাসীদের তৃণমূলী দুষ্কৃতী বলে দাগিয়ে দিতে। বলতে শুনেছি, দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য করে পুলিশ কী রসগোল্লা ছুঁড়বে? এটাই ক্ষমতার অসুখ। ▪

বিচ্ছিন্ন শ্রীভূমি শ্রীহট্ট

জহরলাল পাল

চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রের মূল বাড়ি ছিল শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণে। ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বিল, হাওরে পূর্ণ জেলাটি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। এই শ্রীহট্টই বর্তমানে সিলেট নামে বহুল পরিচিত। শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কযুক্ত পুণ্যভূমিটি রাজনৈতিক চক্রান্তে পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশের অঙ্গ হয়ে ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে জেলাভিত্তিক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভারতের আর কোনও প্রদেশে কোনও জেলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণভোট হয়নি। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অসম প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান শ্রীভূমি শ্রীহট্ট জেলার ভাগ্য নির্ধারণ করার সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্ররোচিত দাবি মেনে নেয়। সেই অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট হয়। সুরমা উপত্যকা (শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা)-র চা শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। শ্রীহট্ট জেলার দুই লক্ষ চা শ্রমিককে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। মুসলিম লিগ দাবি করে যে এই অঞ্চলের চা শ্রমিকরা 'ভাসমান নাগরিক', এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা তারা নয়। শ্রীহট্ট জেলার ভাগ্য নির্ধারণে তাদের মতামত প্রয়োগ করার অধিকার থাকতে পারে না। অথচ অসম বিধান পরিষদের নির্বাচনে তারা ভোট প্রদানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু গণভোটের সময় দুই লক্ষ শ্রমিককে বাদ দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে শ্রীহট্ট পাকিস্তানে চলে যায়। শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্তী জেলা কাছাড়ে তখন জিন্নাপন্থীদের বলতে শোনা যেত— ''সিলেট নিলাম গণভোটে, কাছাড় নিমু লাঠির চোটে।''

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ১৮২৬ সালে ইয়ান্ডাবু সন্ধির মাধ্যমে অহোমরা তাদের রাজপাট তুলে দেয় ইংরাজদের হাতে। অসমে শুরু হয় ঔপনিবেশিক শাসন পর্ব। ১৮৩২ সালে কাছাড় রাজ্য ইংরাজদের অধীনস্থ হয়। এর ফলে অঞ্চলটি প্রশাসনিক ভাবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ হয়ে যায়। ১৮৭৪ সালে তিনটি বাংলাভাষী জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে ঢাকা ডিভিশন থেকে কেটে এনে অসমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। তখনকার সময়ে অসমের জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। রাজস্ব আদায় হত খুবই সামান্য। ইংরেজ শাসকদের প্রশাসনিক যুক্তি ছিল, এই নতুন ব্যবস্থার সাহায্যে চিফ কমিশনার শাসিত নবগঠিত অসম প্রদেশে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। শুধু অর্থনৈতিক যুক্তির মাধ্যমে বাংলাভাষী তিনটি জেলাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করে অসমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলেই প্রথমবারের মতো অসম একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী প্রদেশে পরিণত হয়। যেহেতু শ্রীহট্ট ছিল অসমেরই অন্তর্গত একটি জেলা, তাই শ্রীহট্টবাসীর আগমনই অসমের অন্যত্র ঘটেছিল বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহট্টবাসীকে সঙ্কুচিত করতে গিয়ে শ্রীহট্টকেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো অসম তথা ভারত থেকে।

১৯৪৬ সালের প্রথমভাগে অসম বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর হবিগঞ্জের বিধানসভা কেন্দ্রের সদস্য নির্বাচিত হন সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি তাঁর লিখিত 'ভুলিবে কি প্রাণান্তে' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে শ্রীহট্ট বিচ্ছেদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে :

''বাঙালি বিদ্বেষ কলুষিত অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলৈ ও অনেক অসমিয়া নেতা সিলেটকে অসম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাকিস্তানে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিলেন। আমি তখন অসম বিধানসভার সদস্য তাই গণভোটের ব্যাপারে অসমীয়া নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই। মুখে তাহারা আমাদিগকে সমর্থন জানাইতেন, ভুয়া আশ্বাস দিয়া শ্রীহট্টবাসীদের ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। ভিতরে ভিতরে সিলেটকে অসম হইতে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্র চালাইতেন। গণভোট উপলক্ষে মুসলিম লিগের গুন্ডারা বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা বাঁধাইল, সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিল— ফলে সেই সব জায়গায় ভারতের পক্ষপাতী ভোটদাতারা পোলিং স্টেশনে যাইতে পারিল না। বড়দলৈ সরকার শান্তিরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিলেন না। ভোটের দুইদিন সিলেটে মুসলিম লিগের গুন্ডা- রাজত্ব চলিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলে তাহা নিবারণ করা অসম সরকারের পক্ষে কঠিন হইত না। তাহাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই নির্লজ্জ নিষ্ক্রিয়তায় সিলেটবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমার কংগ্রেসের সহকর্মীরা ও আমি সিলেটকে ভারতের ভিতরে রাখিবার জন্য দিবারাত্র খাটিলাম। সমস্ত মহকুমা ঘুরিয়া আমাদের জেলাকে পাকিস্তানিদের হাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলাম। এই জন্য অনেক বিপদসঙ্কুল জায়গায় যাইতে হইল। আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জায়গা হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক সিলেটে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা হারিয়া গেলাম। করিমগঞ্জে কয়েকটি থানা ছাড়া সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। অনুরূপে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিল।''

শ্রীহট্টের এই নির্বাসন অসমের বাঙালিদের বর্তমান দুরবস্থার অন্যতম কারণ। বলা যেতে পারে বিচ্ছিন্ন এই জেলার আয়তন ছিল আমাদের বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তনের থেকেও বেশি। একটা বিদ্বেষমূলক মানসিকতা নিয়ে অসমীয়ারা শ্রীহট্টকে অসম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই বিদ্বেষের আগুন কিন্তু এখনও তাদের মনের মধ্যে বিরাজ করছে। এর পরিসমাপ্তি কোথায় বিধাতাই জানেন!

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথ
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক M.D. (Homoeo)
ডাঃ পার্থসারথী মল্লিক B.H.M.S (Homoeo)
Acute & Chronic (Cancer, CRF, SOL Brain, Gout, Spondylities, Female Disease etc.) যত্ন সহকারে দেখা হয়
৩০ বছর মানুষের সেবায়
মল্লিক হোমিও হল
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
শাখা-৮৮/১, দমদম রোড, দমদম কুইন (দোতলায়), কলকাতা-৩০
e-mail : mallick2007@gmail.com
website : www.drpmallick.in
Phone : 9830023487/9830502543

অতিথি কলম

প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর জুড়ি মেলা ভার

অমিত শাহ

চলে যাওয়া সপ্তাহটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখোমুখি কথা বললেন লক্ষ লক্ষ আশা, অঙ্গনওয়াড়ি এবং এ.এন.এম. কর্মীদের সঙ্গে। এই বিভিন্ন প্রকল্পাধীন সকলেই কিন্তু তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী। যাদের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে সমাজের নানান স্তরের ওপর। বিশেষত যারা গরিব ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী। তাঁর আন্তরিক অনুপ্রেরণামূলক বার্তার মাধ্যমে এই কর্মীরা সমাজের যে কী অসাধারণ উপকার সাধন করে চলেছেন তা জানানো ছাড়াও তিনি তাঁদের প্রদেয় সাম্মানিকের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এই কর্মীদের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন ঘটানো ছাড়াও এই বৃদ্ধি তাদের নিজ কর্তব্য আরও বাড়তি উৎসাহের সঙ্গে পালনে ইন্ধন জোগাবে।

সমাজের যে অংশের মানুষজন পর্দার আড়ালে থেকে নিরলস কাজ করে যান, প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই তাঁর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। তিনি তাঁদের বোঝান যে সমাজে তাদের মূল্য কারুর চেয়ে কম নয়। জাতির নির্মাণে তাদের অবদান বহুমূল্য। শুধু স্বাস্থ্যকর্মীরাই নয়, তিনি সম্প্রতি শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান।

অমূল্য একটি চারিত্রিক গুণ আমি মোদীর মধ্যে দেখেছি, যেদিন থেকে আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করবার প্রথম সুযোগ পাই। কী সংগঠন কী সরকার দু' ক্ষেত্রের মধ্যে যাঁরাই কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের প্রত্যেককেই তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহিত করেন যাতে তারা নিজেদের বিশিষ্ট বলে মনে করে।

কাজের মানুষটিকে চিহ্নিত করে তার কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ফেরার গুরুত্বকে উপলব্ধি করা এটি তাঁর একটি প্রশংসনীয় মানবিক গুণ। একই সঙ্গে এর দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে তাঁর নিজের কাজ করার উদ্দীপনা কত প্রবল। সত্যি বলতে কী প্রতিটি মুহূর্ত তিনি এমন কিছু না কিছুর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিতে চান যার ফলে এই ভারতভূমি আরও সুন্দর একটি দেশ হয়ে ওঠে।

তাঁর এই ধরনের কাজের ধারা থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় তিনি কী মাপের সংগঠক ও সফল প্রতিষ্ঠান নির্মাতা। পরিশেষে কী সংগঠন কী প্রতিষ্ঠান, উভয়ক্ষেত্রেই তো সেই ধরনের মানুষেরাই গিয়ে একত্রিত হন যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে একই উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তাধারার সহযাত্রী। বাস্তবে তাঁদের এই ত্যাগের উদাহরণ তা যদি আরও উচ্চ অবস্থানে উন্নীত কোনো ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃতি পায় সেক্ষেত্রে নতুন প্রেরণাসঞ্জাত সেই সংগঠন হয়ে ওঠে আরও শক্তিধর।

মোদী এমন একজন মানুষ যিনি সর্বদা খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখেন। আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের বহু অনুষ্ঠানের শুরুর আগে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। প্রদীপের সলতেগুলিকে যদি একটু আগে থেকে ঘি মাখিয়ে রাখা হয় তাহলে যখন অতিথি প্রদীপটি জ্বালাতে যান তা লহমায় জ্বলে উঠতে পারে। অন্যদিকে যে সলতেটি শুকনো সেটি জ্বলতে কিছুটা সময় নেয়। আমি জানি তিনি এই ধরনের কাজেরও খেয়াল রাখেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি নিজেকে একজন তুখড় প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বলতে দ্বিধা নেই গুজরাট সরকারের অন্য অনেকেই তাঁর কাছ থেকে এই গুণটি পেয়েছে।

মোদী বরাবরই আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে খুবই দৃঢ় অবস্থান নেন। তিনি সততা ও ন্যায়ের ওপরই আস্থা রাখেন। সব সময়ই তিনি আমাদের সরলভাবে আইনের পক্ষে থেকে নির্ভয়ে ও কোনওপক্ষকে বাড়তি সুবিধে না দিয়ে আইন মোতাবেক কাজ করে যাওয়াতেই উৎসাহিত করেন। সর্বদাই বড় কিছু ভাবা ও বাস্তবের মাটিতে তা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা তাঁর একটা বিরল গুণ। প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি ব্যাঙ্ক খাতা থাকার স্বপ্ন তাঁর বরাবরের। এই মানসকল্পনা থেকেই সেই কাজের শুরু ও বাস্তবায়িত হওয়া। ৩২ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে জনধন প্রকল্পের মাধ্যমে। একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন! ধোঁয়াচ্ছন্ন রান্নাঘর তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। মনে মনে সঙ্কল্প নিয়েছেন, মায়েদের ধোঁয়াহীন রান্নার উপকরণের ব্যবস্থা করবেন। ৫ কোটি রান্নার গ্যাসের সংযোগ হয়েছে গরিব বাড়িতে।

আরও একটা বিষয় হচ্ছে তিনি কোনও ঘটনা বিশেষকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন না, তিনি সিদ্ধান্ত নেন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। যাকে বলে বড় আকারের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিকল্পনা রূপায়ণ। যেমন কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির সদর্থক অবদান থাকলে তা সর্বদাই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমাদের ভারতের মতো বিশাল দেশে ব্যক্তি প্রচেষ্টা কখনই যথেষ্ট নয়। উদাহরণ হিসেবে দেখুন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। এ বিষয়ে তাঁর সততা ও নিষ্ঠা সন্দেহাতীত। তাঁর অতি বড় শত্রু এটা মেনে

নিয়েছে। তিনি থেমে থাকেননি। তিনি দেশে আরও সুষম আইন ও ভালো প্রতিষ্ঠান নির্মাণে মন দেন যাতে সততা ও স্বচ্ছতা সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়।

বেনামি সম্পত্তি রাখার বিরুদ্ধে আলাদা নির্দেশ জারি করে তিনি বেনামি সম্পত্তির মাধ্যমে কালো টাকা বেড়ে ওঠার মূলে কুঠারাঘাত করেন। অথবা Prevention of Money Landering Act-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংশোধনী এনে এই আইনের আওতায় অর্থনৈতিক অপরাধীর যে টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে তার সম মূল্যের দেশে থাকা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীর ক্ষেত্রে আইন আরও কড়া হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও অস্ত্র প্রয়োগেই তিনি দ্বিধা করেননি তা বিমুদ্রীকরণই হোক বা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইনটারভিউ নামক ঘুঘুর বাসা ভাঙাই হোক। এই ভাবে দেশের বাতাবরণেই একটা সামগ্রিক সততার আবহ তৈরি করার প্রয়াস নিয়েছেন তিনি।

একই ভাবে অটলজীও ছিলেন এমনই এক নেতা যিনি দেশকে উন্নয়নমুখী করেছিলেন। দেশের প্রসিদ্ধ সংস্থাগুলিতে প্রয়োজনীয় বহুমুখী সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার গৌরব তাঁরই। টেলিকম, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, চাকরি, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রগুলিই সামগ্রিক ভাবে নতুন গতি পায়। এর মূলে ছিল তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব। এরই চূড়ান্ত পরিণতিতে বিজেপিকে একটি সুশাসন প্রদানকারী বিশিষ্ট চরিত্রের তকমা দেওয়া হয়।

মোদীজীর বর্তমান শাসনকালে গ্রামীণ রাস্তাঘাটের নির্মাণ দ্বিগুণ তৎপরতায় এগিয়ে চলেছে। পূর্বতন জমানায় সচারাচর হাইওয়ে তৈরির যে সময়সীমা নির্ধারিত থাকত এখন তার অর্ধেক সময়ে কাজ শেষ করা হচ্ছে। গ্রামের গরিব গৃহস্থ বাড়িগুলিতে দ্রুত বিদ্যুৎ ও রান্নার গ্যাস পৌঁছে যাচ্ছে। কোটি কোটি গৃহে শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা অভিযান সার্থক হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে অপুষ্টি দূরীকরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে লড়াই শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে হয়তো সকলেই জেনে গেছেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারতের মতো বিশাল প্রকল্পের চালু হয়ে যাওয়ার কথা। এটি একটি আক্ষরিক অর্থেই গেম চেঞ্জার হতে চলেছে।

এই ধরনের কর্মকাণ্ড ভারতের একটি দুটি রাজ্যের বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ছড়িয়ে পড়েছে ভারতময়। একবার ভাবুন, উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত দুর্গম এলাকা এখন গোটা দেশের সঙ্গে রেলপথে সংযুক্ত। অতীতে এমন নজির ছিল না। দেশের প্রায় সমস্ত পরিবারেই এখন নিদেনপক্ষে একটি করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে, সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রসঙ্গে এই ধরনের গুণগত পরিবর্তন আনার ফলেই বিজেপি দলের ওপর মানুষের শুভেচ্ছা ও বিশ্বাস যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি যখন লোকের মুখে শুনি যে বিজেপি এখন এক ধরনের ইলেকশন মেশিনের চেহারা নিয়েছে, তখন আমার মনে হয় উন্নয়ন ও নিরন্তর প্রগতিই বিজেপির 'নির্বাচনী যন্ত্র'।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন সব অঞ্চলে যেখানে বিজেপির হয়তো নামমাত্র উপস্থিতি ছিল সেখানে দলকে নিজের ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তির মাধ্যমে শক্তিধর করে তুলেছেন। টাটকা উদাহরণ উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিজেপির আজকের অবস্থা। আজকে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি যখন একের পর এক রাজ্যে মানুষের শুভেচ্ছায় নির্বাচিত হয়ে আসছে, তার কারণই হচ্ছে সুশাসন। এই সুশাসনের মাধ্যমেই মোদী অত্যন্ত সফলভাবে তাঁর নিজের মধ্যে সদা জাগ্রত নতুন ভারতের বীজমন্ত্র 'আমরাও পারি' এই অনুরণন জাতির মধ্যেও সঞ্চারিত করেছেন।

“আজকে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি যখন একের পর এক রাজ্যে মানুষের শুভেচ্ছায় নির্বাচিত হয়ে আসছে, তার কারণই হচ্ছে সুশাসন। এই সুশাসনের মাধ্যমেই মোদী অত্যন্ত সফলভাবে তাঁর নিজের মধ্যে সদা জাগ্রত নতুন ভারতের বীজমন্ত্র ‘আমরাও পারি’ এই অনুরণন জাতির মধ্যেও সঞ্চারিত করেছেন।”

রম্যরচনা

পল্টুর বকর বকর

শিক্ষক : তুমি বড্ড বেশি কথা বল পল্টু। খালি বকর বকর...

পল্টু : কী করব স্যার। এটা তো আমাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন।

শিক্ষক : ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন? কী রকম?

পল্টু : আমার দাদু ছিলেন দোকানদার। সারাদিন বকবক করে খদ্দের জোটাতেন। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। ছাত্র পড়াতে পড়াতে বাবার মুখে গ্যাঁজলা উঠে যেত। কাকা যাত্রা করতেন। রাত জেগে যাত্রার ডায়লগ বলতে হতো।

শিক্ষক : আর পিসি?

পল্টু : স্যার, তিনি রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন। সকাল থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

****

পশ্চিমবঙ্গ

গোলা বারুদ আর বোমায় ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।
তাহার মাঝে আছে রাজ্য এক সকল রাজ্যের সেরা।
রাজনীতিতে তৈরি সে রাজ্য দুর্নীতিতে ঘেরা।
এমন রাজ্য কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
বলতে মাগো লজ্জা করে সে যে আমার জন্মভূমি।

উবাচ

❝ভারতের শান্তি ও বিকাশে বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা হলে সমুচিত জবাব দেবে সেনাবাহিনী।❞

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এ মন্তব্য

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

❝পাশ্চাত্য রীতিতে গুডমর্নিং বা গুড নাইট নয়। নমস্কার বলার প্রথা চালু করুন। নমস্কার আমাদের দেশের সংস্কার।❞

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে

বেঙ্কাইয়া নাইডু
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

❝কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার আগে পাকিস্তানের উচিত নিজেদের গলদ শোধরানো।❞

সংবাদ সংস্থার সঙ্গে আলাপচারিতায়

নাদিম নুসরত
ভয়েস অব করাচির চেয়ারম্যান তথা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত মার্কিন রাজনীতিক

❝রাজ্যে পরিকল্পনা করে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী ঢুকতেই জেলায় জেলায় অশান্তি শুরু হচ্ছে।❞

সম্প্রতি বর্ধমানের জনসভায়

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপির সভাপতি

❝একদিকে মহিলাদের দেবী মনে করে পূজা করা হয়, অন্যদিকে তাঁদের ওপর নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক কোনও মতেই জৈবিক বা শারীরিক কারণে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।❞

সবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত রায়ে

দীপক মিশ্র
ভারতের প্রধান বিচারপতি

দাড়িভিটের ঘটনার সি বি আই তদন্ত দরকার

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ইসলামপুরের দাড়িভিট বিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত তথ্যকে আড়াল করতে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকগণ। অথচ দাড়িভিটের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনাটি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে— গত ২০ সেপ্টেম্বর ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ন্যায্য দাবিতেই আন্দোলন করছিল। ওই বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা, ইতিহাস, বিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পড়ানোর মতো শিক্ষক নেই। এই বিষয়গুলির শিক্ষকের পদ পূরণ না করে গত ২০ তারিখ উর্দু এবং সংস্কৃতের দুই শিক্ষককে কাজে যোগদান করাতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে কখনই অন্যায্য বলা যাবে না। বলা যাবে না এই কারণেই যে— তারা বাংলা শিক্ষকের দাবি জানাচ্ছিল। যে বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষকের অভাব রয়েছে, সেখানে বাংলা শিক্ষক নিয়োগ করার দাবি কখনই অন্যায্য বা অন্যায় নয়। তদুপরি, ওই বিদ্যালয়ে উর্দু পড়ার কোনো ছাত্র-ছাত্রীই নেই। তবু উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করে কেন উর্দু পড়ানোর তোড়জোড় করছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ— সে সংশয় থেকেই যায়। দাড়িভিট বিদ্যালয়ের ঘটনাটি যাঁরা বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা জেনেছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ প্রথম থেকেই হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল। মাঠের ওপর দিয়ে জোরে জিপ ছুটিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিকভাবে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল। পরে বেধড়ক লাঠি চার্জ। এবং সর্বশেষে গুলি। দাড়িভিটের ওই পুলিশি বর্বরতায় তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশের এই নক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই। কিন্তু তার থেকেও নিন্দনীয় মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকা। দাড়িভিটের ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা পর পুলিশ একটি তত্ত্ব বাজারে ছাড়ার চেষ্টা করেছে। তা হলো, দাড়িভিটেতে পুলিশের গুলিতে কারো মৃত্যু হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শীরা এবং মৃতদের পরিবার-পরিজন অবশ্য পুলিশের এই আজগুবি তত্ত্ব মানতে চাইছেন না। তাঁরা পরিষ্কার বলছেন, ওইদিন গুলি পুলিশই চালিয়েছিল। মৃত্যু পুলিশের গুলিতেই হয়েছে। পুলিশের গুলি চালনা সংক্রান্ত নানাবিধ অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখে পড়ে জেলার পুলিশ সুপারও সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন।

পুলিশ গুলি চালায়নি— এই তত্ত্বটির উদ্গাতা যে শুধুমাত্র পুলিশ— তা বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্বটির উদ্গাতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। দাড়িভিটের ঘটনার সময় কয়েক হাজার মাইল দূরে ইতালির ফ্যাশন নগরী মিলানে ছুটি কাটাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওখান থেকেই তিনি নিদান দিয়ে দেন— ‘পুলিশ গুলি চালায়নি’। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রথমত, পুলিশ যে গুলি চালায়নি— এ তথ্য তিনি জানলেন কীভাবে? কোনও তদন্ত তো হয়নি। তদন্ত হওয়ার আগেই এভাবে অভিযুক্ত পুলিশকে কি ক্লিনচিট দিয়ে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি পুলিশ গুলি না চালিয়ে থাকে— তাহলে গুলি কে চালালো? পাঠকের স্মৃতিতে নন্দীগ্রামের ঘটনা এখনও নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছে। যদি থেকে থাকে, তাহলে পাঠকের নিশ্চয়ই এও মনে আছে, নন্দীগ্রামে গুলি চালনার পর মুখে গামছা বাঁধা, পায়ে চপ্পল পরা পুলিশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন কথার পর আবার একটি সংশয় দেখা দিয়েছে যে, নন্দীগ্রামের সেই গামছা বাঁধা চপ্পল পরা পুলিশই আবার ফিরে এলো কিনা। সংশয় দেখা দেওয়ার কারণ এই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রথমাবধিই সিপিএমের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়েছে। ফলে, সিপিএম জমানার মতোই এই জমানাতেও যদি গামছা বাঁধা চপ্পল পরা পুলিশ সরকারের মান রক্ষার্থে হাতে বন্দুক তুলে নেয়— তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। পুলিশ গুলি চালায়নি— মুখ্যমন্ত্রীর এহেন তত্ত্ব খাড়া করার পিছনে একটি গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। বোঝাই যাচ্ছে, সত্যকে আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই

বাজারে এরকম একটি ধারণা চালু করে দিতে চাইছেন। এও বোঝা যাচ্ছে, এর পরে দাড়িভিটের ঘটনার যতই তদন্ত করুক না রাজ্য সরকার— মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক করে দেওয়া এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে তারা যাবে না। তার বড় প্রমাণ, পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য। কোনোরকম তদন্ত হওয়ার আগেই তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে শুরু করেছেন— পুলিশ গুলি চালায়নি। অর্থাৎ, ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তাকে আড়াল করার অপচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এখানেই থামেননি। ওই ঘটনার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন— বিজেপি এবং আর এস এস-ই এই ঘটনার পিছনে জড়িত। তারাই দাড়িভিট বিদ্যালয়ে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন— ঝাড়খণ্ড থেকে লোক নিয়ে এসে বিজেপি গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে। এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়— এই অভিযোগের সত্যতা কী? কোন তদন্তে উঠে এসেছে এরকম তথ্য? মুখ্যমন্ত্রীর পদটি দায়িত্বশীল। সেই পদে বসে এরকম হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া অভিযোগ যে করা যায় না— তা নিশ্চয়ই জানেন মুখ্যমন্ত্রী। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয়, তাঁর এই অভিযোগ ভিত্তিহীন--- তাহলে ক্ষমা চাইবেন তো তিনি? অবশ্য ভিত্তিহীন অভিযোগ করা এবং পরে তা বেমালুম ভুলে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাবগত। বামফ্রন্ট জমানায় এক গৃহবধূর ধর্ষণের অভিযোগ তুলে তিনি আসর জমাতে চেয়েছিলেন। পরে তা যে নিতান্তই অসত্য অভিযোগ ছিল— তা প্রমাণ হওয়ার পর বেমালুম চুপ মেরে যান তৎকালীন বিরোধী নেত্রী। এছাড়াও ফেলানি বসাক নাম্নী এক মূক-বধির লাঞ্ছিতা মহিলাকে নিয়ে এসে মহাকরণে বিক্ষোভ দেখিয়ে নিজের রাজনৈতিক প্রচারের কাজটি সেরে নিয়ে পরে ওই হতভাগিনী মহিলার আর কোনো খোঁজই রাখেননি তৎকালীন বিরোধী নেত্রী। ফলে, এবারও অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হলে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন--- এই রাজনৈতিক সততা তাঁর কাছে আশা করাই বৃথা। মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ তুলেছেন— বিজেপি-আর এস এস-ই দাড়িভিটের ছাত্রদের হত্যা করে এখন আন্দোলন করতে নেমেছে। এ অভিযোগ মারাত্মক। এসব অভিযোগেরই তদন্তই হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই সত্য বেরিয়ে আসবে। বোঝা যাবে— মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সারবত্তা কতখানি আর প্রকৃত ঘটনাই বা কী? মুখ্যমন্ত্রী এই যে সব অভিযোগ তুলছেন— এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধিটি কী— তা বুঝতেও খুব একটা অসুবিধা হয় না। পুলিশ গুলি চালায়নি এই তত্ত্ব খাড়া করার পাশাপাশি, বিজেপি-আর এস এসকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রীই কার্যত পুলিশকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কী পদক্ষেপ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পুলিশ যাই বলুক না কেন, দাড়িভিটার নিহত ছাত্র রাজেশ সরকারের মা একটি মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, রাজেশ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে যখন একটি গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একটি গ্রামে গাড়িটি আটক করা হয়। যাঁরা রাজেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মারধর করা হয়। এমনকী, গুলিবিদ্ধ রাজেশকেও মারধর করা হয়। রাজেশের দেহে সেই আঘাতের চিহ্ন আছে বলেও দাবি করেছেন তার মা। প্রশ্ন— রাজেশ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেনি কেন? আর কারাই বা মাঝপথে গাড়ি আটকে গুলিবিদ্ধ রাজেশকে মারধর করেছিল? দাড়িভিটের ঘটনা অনেকগুলি সন্দেহ এবং সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। কাজেই এই ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। তবে, সে তদন্ত কখনই রাজ্য পুলিশ, রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর বা রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থার মাধ্যমে নয়। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থা তদন্ত করলে, তা মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে। তদন্তের নামে তা হয়ে উঠবে প্রহসন। কাজেই এই তদন্ত হোক সিবিআই বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোনও নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমেই। ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তের দাবিতে নিহত দুই ছাত্রের পরিবার পরিজন তাদের দেহ দাহ না করে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে। উদ্দেশ্য একটাই— দ্বিতীয়বার দেহদুটির ময়নাতদন্ত হোক। এই ঘটনাটিও কিন্তু অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে কোনও হিন্দু পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবিতে তাদের সন্তানদের দেহ দাহ না করে মাটি চাপা দিয়ে রাখেনি। এই অভূতপূর্ব ঘটনাটিই প্রমাণ করে দিচ্ছে, নিহতদের পরিবার-পরিজন মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করছে না।

এরই ভিতর দাড়িভিট বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির এক সদস্য তপনকুমার মজুমদারও এক মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, পরিচালন সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল উর্দু এবং সংস্কৃত শিক্ষককে ফেরত পাঠানো হবে। তারপরও পরিচালন সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে অন্ধকারে রেখে ওই দুই শিক্ষককে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কে নিয়েছিল এই সিদ্ধান্ত? তপনকুমার মজুমদার বলেছেন, এই কারণেই তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ-প্রধান শিক্ষক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামপুর থানা সেই অভিযোগ গ্রহণ করেনি। কেন করেনি? কী উদ্দেশ্যে থানা সেই অভিযোগ গ্রহণ করেনি? মুখ্যমন্ত্রী নিরন্তর তাঁর মনে যা চায় সেই অভিযোগ করে চলেছেন। বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারকে কাঠগড়ায় তুলছেন। কিন্তু দাড়িভিটের ঘটনায় তার প্রশাসন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে— তার কোনও সদুত্তর তিনি দিতে চাইছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য একটিই। মিথ্যা, মিথ্যা এবং ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করে সত্যকে জনসমক্ষ থেকে আড়াল করা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই অপচেষ্টা যদি সফল হয়--- তাহলে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হবে। কাজেই সত্য উদ্ঘাটনের জন্যই দাড়িভিটের ঘটনার সিবিআই তদন্ত দরকার। সেই তদন্তই প্রমাণ করবে--- সত্যকে আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী কোন রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ■

আজাদহিন্দ সরকারের প্লাটিনাম জয়ন্তী ও নেতাজী সুভাষ

প্রণব দত্ত মজুমদার

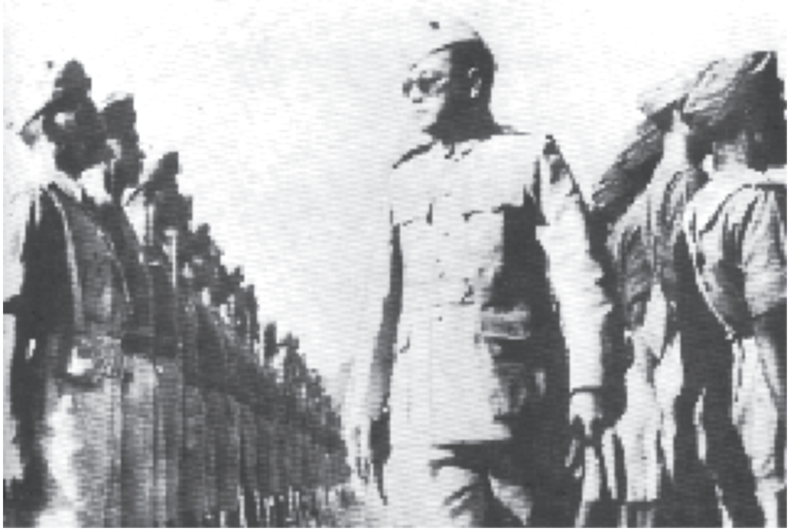

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বছর পূর্ণ হবে ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর অর্থাৎ প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ। ১৯৪৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কোহিমা, ইম্ফল পর্যন্ত দখল করে ফেলেছিলেন। সেখানে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর গঠন করেছিলেন স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার। উত্তোলন করেছিলেন স্বাধীন ভারতের তিরঙ্গা পতাকা। বিশ্বের ১১টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল সেই স্বাধীন সরকারকে। সেই সমস্ত দেশে কূটনৈতিক অফিসও স্থাপিত হয়েছিল। ছাপা হয়েছিল স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের কারেন্সি। ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রথম স্বাধীন ভারতীয় সরকার হলো আজাদ হিন্দ সরকার। এর প্রধান ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবময় দিন এটি, অথচ এই দিনটিকে সেরকম কোনও গুরুত্বই এতদিন দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং তাঁর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাই যে মুখ্য ছিল, কেবল গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলেই যে স্বাধীনতা আসেনি, সেই সত্যটাকেই এতদিন চেপে রাখা হয়েছে।

১৯২১ সালে আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ইংরেজের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে দেশে ফিরে গান্ধীজীর ডাকা অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই আন্দোলন যখন তীব্র আকার নেয় তখন ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন সত্যাগ্রহীরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে এই অজুহাতে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের মূল মন্ত্র ছিল— 'সত্যাগ্রহীরা মার খেয়ে মরে যাবে, কিন্তু কাউকে আঘাত করা যাবে না।'

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ ডাণ্ডি অভিযানের মাধ্যমে আবারও অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন গান্ধীজী। বিলেতে 'গোল টেবিল বৈঠকে' আলোচনার ডাক পেতেই আবারও গান্ধীজী মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে আলোচনার গোল টেবিল বৈঠকে বসার জন্য লন্ডন চলে গেলেন। ফিরে এলেন খালি হাতে।

গান্ধীজী কখনোই তাঁর আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাননি। গান্ধীজীর এই ধরনের আন্দোলনে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু-সহ অনেকেই। সুভাষচন্দ্র তখন বলেছিলেন— "The latest act of Mohatma Gandhi in suspending civil disobedience is a confession of failure. We are of opinion that the Mohatma as a political leader has failed. The time has come for a radical re-organisation of the Congress on a new principle with a new method for which a new leader is essential, as it is unfair to expect the Mohatma to work on a programme not consisted with his lifelong principle."

সুভাষ ছিলেন গরমপন্থী নেতা। গান্ধীজী বিপ্লবীদের ইংরেজ মারাকে সমর্থন করতেন না। ক্ষুদিরাম, ভগত সিংহ, সূর্য সেনের মতো বিপ্লবীদের বিপথগামী বলতেন। সুভাষ কিন্তু বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তীব্র দেশেপ্রেমে নিবেদিতপ্রাণ সেইসব তরুণশক্তিকে কী করে সুসংবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করা যায় তার কথা ভাবতেন, তার পরিকল্পনা করতেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর কঠিন লড়াকু মনোভাবের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি কংগ্রেসকে গান্ধীজীর প্যাসিভ আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে আরও অ্যাকটিভ আন্দোলনের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাও ঢোকাতে চাইলেন কংগ্রেসের মধ্যে। সুভাষের এসব কাজকারবার গান্ধীজীর মোটেই পছন্দ হলো না। সুভাষ শীর্ষে থাকলে গান্ধীজীর রাস্তা থেকে কংগ্রেস

সরে যাবে, এই দুশ্চিন্তা থেকে পরের বছর ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র যাতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি না হতে পারেন তাঁর ব্যবস্থা করেন গান্ধীজী। তা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন; কিন্তু গান্ধীজী কূটকৌশলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজী তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারও করেন। সুভাষ কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করে তাঁর সংগ্রাম বজায় রাখেন।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে অধ্যাদেশ জারি করে সব রকম মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করে ইংরেজ সরকার। ১৯৪০ সালে ৩ জুলাই সুভাষচন্দ্র ইংরেজ সরকারের এই ফরমানের বিরোধিতা করে, তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ১৫০ বছর ধরে কলকতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা ইংরেজ দাসত্বের প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার জন্য মিছিল আরম্ভ করলেন। ইংরেজের পুলিশ তাঁকে 'Defence of India Act'-এর আওতায় গ্রেপ্তার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকিয়ে দিল। এটা ছিল সুভাষের ১১তম জেলযাত্রা। সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করলেন বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে জেলে বন্দি থাকলে হবে না। জেল থেকে বেরুতেই হবে। ইংরেজকে আঘাত করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি আমরণ অনশনের হুমকি দিলেন। ইংরেজ সরকার উপলব্ধি করল সুভাষ যদি জেলের মধ্যে যতীন দাসের মতো অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন তবে দেশ জুড়ে যে অশান্তি আরম্ভ হবে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই ইংরেজ সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অসামান্য দক্ষতায় ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি রাতে ইংরেজের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

আফগানিস্তান হয়ে জার্মানি পৌঁছে তিনি সেখানকার বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করলেন। তাদের সহায়তায় জার্মানির বিদেশ দপ্তরের অধীনে তৈরি হলো— 'Working Group India', 'Special Department for India', 'Azad Hind Radio' ইত্যাদি। এই 'আজাদ হিন্দ রেডিও' থেকে ১৯৪১ সালের নভেম্বরে জার্মানির বার্লিন থেকে সারা ভারতকে স্তম্ভিত করে ভেসে এল নেতাজী সুভাষের কণ্ঠস্বর— 'আমি সুভাষ বলছি'। এর আগে কেউ ভাবছিলেন ইংরেজরা তাঁকে গুম করে দিয়েছে, কেউ ভাবছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ ভেসে আসতে লাগলো আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে।

সুভাষ ১৯৪২ সালের ৫ মে ইটালির রোমে গিয়ে মুসলিনির সঙ্গে মিটিং করেন এবং অনেক চেষ্টার পরে ১৯৪২ সালের ২৯ মে তিনি তখনকার বিশ্বত্রাস হিটলারের সঙ্গে মিটিং করেন। নেতাজী চেয়েছিলেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে। হিটলারের কাছ থেকে অবশ্য খুব একটা ইতিবাচক সাড়া পাননি সুভাষচন্দ্র। তিনি বুঝলেন জার্মানিতে থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করলে চলবে না। এদিকে মিত্রশক্তির শরিক জাপান ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর 'অ্যালাইড ফোরস'-এর ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাপান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীকে পর্যদুস্ত করছিল। সুভাষ ঠিক করলেন তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপানি সহায়তায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বেন।

এদিকে রাসবিহারী বসু জাপানে থেকে পূর্ব এশিয়াতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের আওতায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ইংরেজ বাহিনীর হয়ে লড়াই করে পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে প্রায় ৪৫০০০ ভারতীয় সৈনিক জাপানের কাছে বন্দি হয়েছিলেন, রাসবিহারী বসু সেইসব যুদ্ধবন্দিদের দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদবুদ্ধ করে গঠন করেছিলেন 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'। ১৯৪২ সালের জুন মাসে জাপান সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'-এর পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হলো তিনি যেন ইস্টএশিয়ার রণাঙ্গনে এসে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বও নেন। সুভাষ এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। তিনি এই ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি জার্মান নৌবাহিনীর সহায়তায় ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কিয়েল বন্দর থেকে সহযোগী আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মান সাবমেরিনে জাপানের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যাত্রা আরম্ভ করলেন। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে, অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে, ভারত মহাসাগর হয়ে দীর্ঘ সমুদ্র পথে দু' মাসেরও বেশি সময় সাবমেরিন যাত্রা করে মাদাগাস্কার (Madagaskar)-এর দক্ষিণে এসে পৌঁছুলেন এবং সেখানে অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে রাবার বোটে করে জাপানি সাবমেরিনে গিয়ে উঠলেন এবং ১৯৪৩ সালের ২৮ এপ্রিল ইস্ট এশিয়ার জাপানি বেসে এসে পৌঁছুলেন। প্রশিক্ষিত দক্ষ সামরিক অফিসারদের পক্ষেও সাবমেরিনে এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের কাজ ছিল। কী সাঙ্ঘাতিক শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা থাকলে এই কাজ করা সম্ভব।

তারপর সেখান থেকে জাপানের টোকিও যান তিনি। সেখানে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। ১০ জুন জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজের সঙ্গে তাঁর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয় যুদ্ধসংক্রান্ত রণকৌশলের ব্যাপারে।

১৯৪৩ সালের ২৭ জুন রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে পৌঁছান সুভাষচন্দ্র। ৪ জুলাই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন রাসবিহারী বসু এবং সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির পদে বরণ করে নেওয়া হয়। পরদিন তাঁকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে বরণ করে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে উদাত্ত দেশাত্ববোধক ভাষণে সৈনিকদের মন জয় করে নেন, সৈনিকরা দেশের জন্য প্রাণদানের

জন্য উদবুদ্ধ হয়ে উঠলো। সকলের হৃদয়ের নেতা হয়ে গেলেন তিনি। সবাই তাঁকে নেতাজী বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলেন। সেখানেই তিনি রননাদ তুলেছিলেন--- 'দিল্লি চলো' 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ'।

আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রায় ৬০,০০০ সৈনিক এবং ১,৫০০ অফিসার যোগদান করেন। নেতাজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহু তেজোদীপ্ত মহিলা দেশের জন্য প্রাণ দানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, নেতাজী তাদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'রানি ঝাঁসি বাহিনী'। নেতাজী তাঁর 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' নিয়ে জাপানি সহায়তায় পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অনেক এলাকা দখল করতে করতে কোহিমা, ইম্ফল (যা নাগাল্যান্ড, মণিপুর) পর্যন্ত দখল করে নিলেন। প্রায় ২৬,০০০ সৈনিককে প্রাণ দান করতে হয়েছিল এই যুদ্ধে। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার' যার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। জাপানিরা আগেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল, জাপান সরকার এই দ্বীপগুলি আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। নেতাজী এদের নাম দিয়েছিলেন— স্বাধীন ও স্বরাজ দ্বীপ।

যাই হোক ১৯৪৪ সালের মে মাস থেকে জাপান পরাজিত হতে থাকে। অবশেষে মিত্রপক্ষের শরিক আমেরিকা, সারা বিশ্বকে হতচকিত করে, ৬ ও ৯ আগস্ট (১৯৪৫) জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেললো। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলো মিত্রপক্ষের কাছে। স্বাভাবিক ভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও আত্মসমর্পণ করতে হলো। ঠিক হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র আবারও আত্মগোপন করবেন। তার আগে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিটিং করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈনিক এবং সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষদের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ বার্তা রেখে গিয়েছিলেন তা হলো— ''প্রিয় ভগিনী ও ভাইয়েরা, ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি একটা কথাই বলবো যে আপনারা এই সাময়িক পরাজয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন না। আপনাদের উদ্যম ও প্রেরণাকে ধরে রাখুন, মনকে প্রসন্ন রাখুন, এক মুহূর্তের জন্যও ভারতের অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস হারাবেন না। বিশ্বের কোনও শক্তিই ভারতকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারবে না। ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধীন হবে।'' এই বার্তার দু' বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হয়েছিল।

এরপর তাঁর আর কোনও সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকে মনে করেন ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট জাপানের টোকিও যাওয়ার পথে তাইওয়ানের তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু নিয়ে সর্বশেষ যে তদন্ত কমিশন হয়েছিল সেই বিচারপতি মনোজ মুখার্জি কমিশনের (১৯৯৯-২০০৫) মতে ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের কোনও সমাধান আজও হয়নি।

যাই হোক ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে দিল্লির লাল কেল্লায় বিচার আরম্ভ হয়। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক যুদ্ধ ও আত্মবলিদানের কাহিনী সারা ভারতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজের বাহিনীতে যেসব ভারতীয় সৈনিকরা আছেন তাঁরা যখন দেখলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে তাঁদের বন্ধু ও ভাইয়েরা দেশের স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো লড়াই করেছেন, অবলীলায় প্রাণদান করেছেন। আবার সেই বাহিনীরই বিচার করে শাস্তি দেওয়ার তোড়জোড় করছে ইংরেজ সরকার তখন তাঁরা দেশপ্রেমের আবেগে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। সারা ভারত জুড়ে সেনা বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম বিদ্রোহ করল নৌবাহিনী তারপরে পদাতিক ও বিমানবাহিনীর ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যেসব অস্থায়ী সৈনিকদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁরাও অস্ত্র হাতে ইংরেজদের ধাওয়া করল। রাস্তাঘাটে ইংরেজ নারীপুরুষদের গাড়িঘোড়া থেকে নামিয়ে টুপি খুলে 'জয় হিন্দ' বলতে বাধ্য করলেন তাঁরা। সারা ভারতের মানুষও ক্ষোভে ফুঁসছিল, দিকে দিকে তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ হলো। ইংরেজরা প্রাণের ভয়ে কুঁকড়ে গেল। বলা চলে, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারকে কেন্দ্র করে সারা ভারত জুড়ে আর একটি সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের অভিঘাত সারা ভারত জুড়ে এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে ইংরেজ সরকার বুঝল তাদের দিন শেষ। তাই ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নির্মম ভাবে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারলেও ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ জয়ী ইংরেজ সরকার এই সিপাহী বিদ্রোহকে প্রচণ্ড ভয় পেল। তাই তাঁরা তাড়াতাড়ি রাজ্যপাট গুটিয়ে ভারত ছেড়ে পালাল মানসম্মান নিয়ে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে যিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই ক্লিমেন্ট অ্যাটলি, ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জাস্টিস পি বি চক্রবর্তী কৌতূহলবশত অ্যাটলির কাছে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের কারণ কী তা জানতে চেয়েছিলেন। অ্যাটলি তখন বলেছিলেন— আই এন এ-র বিচারকে কেন্দ্র করে যে সেনা বিদ্রোহ হয়েছিল তার থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতিই তাঁদের ভারত ত্যাগের কারণ। ভারতে স্বাধীনতার ব্যাপারে গান্ধীজীর ভূমিকা কী জানতে চাইলে, অ্যাটলি বক্রোক্তি করে বলেছিলেন –M–I–N–I–M–A–L. অর্থাৎ খুবই নগণ্য (এইভাবে সিলেবল ভেঙ্গে বলাতে গান্ধীজীর প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বক্তব্যে)।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বসু সেইসঙ্গে রাসবিহারী বসু, ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত এবং স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার দিনটিকে (৪৩ সালের ২১ অক্টোবর) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সঠিক গুরুত্ব না দিলে সেটা হবে জাতির লজ্জা। ■

চিঠিপত্র

অকারণে জলের কল খুলে রাখা ভয়ঙ্কর অপরাধ

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও কলকাতা ও নিকটবর্তী শহরতলি ও রাজ্যের পুরসভা শহরগুলিতে দেখা যেত বস্তি অঞ্চলে পানীয় জলের কলে লম্বা লাইন। বালতি-কলসি-জার-ঘটি পাতা রয়েছে একের পর এক, জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে নিত্য ঝগড়া-বচসা, কখনও মারামারি। আর জলের ধারাও সেইরকম অতি ধীর। দিনে সব সময় জল পাওয়া যেত না। দিনের নির্দিষ্ট সময় কয়েক ঘণ্টার জন্যই জল মিলত। সেখানে বলশালী দাদা-দিদিদের দাপাদাপি। ক্ষমতা অনুযায়ী কেউ আবার কলে লম্বা পলিথিনের পাইপ বসিয়ে বাড়ির বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। সেটা খুলে জল নিতে গেলে গালাগালি আর চড়-চাপড় জোটাটাও এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক পুরসভাগুলিতে অনেক কল বসানো হয়েছে। কোথাও শাসক দলের সমর্থকদের এলাকায় স্বল্প দূরত্বে কল বসানো হলো। কোথাও আবার জুটলো বঞ্চনা। খরাপ্রবণ এলাকার কথা তো বাদই দিলাম। কলকাতার কাছাকাছি যেসব জেলার মানুষ পানীয় জলের প্রবল সংকটে ভুগেছিলেন, তারাই অফুরান জল পেতে পেতে কল বন্ধ করতে ভুলে গেলেন। যতক্ষণ তাঁর স্নান শেষ না হচ্ছে বালতিতে উপচিয়ে সমানে জল না গড়ালে তাদের পবিত্র স্নান শেষ হবার নয়। অতি উৎসাহী মানুষ আবার কলের মুখ লাগালে নিয়মিত ভেঙেও দিলেন। পুরসভাগুলিও কলের মুখ বসাতে প্রবল অনীহা দেখাতে শুরু করল।

রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হোস্টেলগুলিতে দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা যতক্ষণ না তাদের মলত্যাগ শেষ হচ্ছে জলের প্রবাহ বজায় রাখেন। স্নানের সময়ও তাই। এই অভ্যাস প্রায় সমস্ত বাঙ্গালি পরিবারের মধ্যে আছে। ভাবি না এভাবে রোজ কত লক্ষ-কোটি গ্যালন জলের অপচয় হচ্ছে। ভাবি না এই জল ভূগর্ভে জমা হতে কত সময় লাগে। কখনও ভেবে দেখিনি ব্যাপক ভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নিলে জলে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা কতটা বাড়ে। কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য অবিবেচনাপ্রসূত ভাবেও কত জলের অপচয় হচ্ছে।

বস্তি এলাকার মানুষকে বোঝাতে হবে জলের অপচয় একেবারেই ঠিক কাজ নয়। পুরসভাগুলিকে নিয়মিত কলের মুখ পরীক্ষা করে লাগাতে হবে। নিজেরাও নজর রাখুন। ছোটো ছেলে-মেয়েদের শেখাতে হবে ব্যবহারের পর কলের মুখ বন্ধ করতে হয়। রাস্তাঘাটে কলের মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে জলের অপচয় রোধ করতে হবে। ধাতব কলের মুখ দু' পয়সার জন্য যারা চুরি করে, তাদের পাকড়াও করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে। এই অপচয় রোধ করা না গেলে আগামীদিনে সরকারকে জলের ব্যবহারের উপরে ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। যত্র তত্র নির্মাণ করা অপচয়ের কল বন্ধ করে দিতে হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলিতে হিসেব করে জল ব্যবহার করা নির্দেশিকা চালু করতে হবে। সেখানে সারাদিন ধরে মোটর চালিয়ে জল উঠতেই থাকবে, এটা চলতে পারে না। আবাসনগুলির কমিটিকে সচেতন হতে হবে জোরালো প্রচার চালাতে হবে। জলের অপচয় মানে টাকার অপচয়।

জল নষ্ট করার পাপ যেন অন্যকে তৃষ্ণার্ত করে মেরে ফেলার পাপের সমতুল্য হয়।

—ড. কল্যাণ চক্রবর্তী,
অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী।

মসজিদে প্রধানমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের দুঃশাসনযন্ত্রের শাসকদের তো বটেই, সমগ্র পৃথিবীবাসীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মসজিদে গিয়ে তুর্কিটুপি মাথায় না লাগিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভারত জীবন প্রবাহের ঐতিহ্য। তিনি বুঝিয়ে দিলেন আত্মিক চেতনা জাগরণে ভারত বিশ্ববাসীর কাছে আজও আলোর পথদিশারি চিরায়ত শান্তির দিকদর্শিকা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বার্তা দিলেন জাতীয়তাবোধ মৈত্রী সৌহার্দ্য সাংস্কৃতিক ঐক্য মানবতার মহানুভবতায় বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত গীতা জগদ্‌বাসীর হৃদয়ে শতদলামৃতময় নবজীবনের জয়ধ্বজা উড্ডীন রেখেছে। জানা কথা যে, তাঁবেদারি সংবাদমাধ্যম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই চিরঞ্জয়ী চিন্তাচেতনার রুচিহীন বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালাতে থাকবে।

—অসিত কুমার সিংহ,
ধাড়সা, হাওড়া।

ভারতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পথে

জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়লে তা যে রাষ্ট্রের ভয়ানক সমস্যা তা সর্ববাদী সম্মত। যে সকল দেশের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিরাট সমস্যা তার মধ্যে চীন, ভারত ও বাংলাদেশ প্রধান। কিন্তু সমাধানের যে পথ— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সে ব্যাপারে সেই দেশগুলির পরিস্থিতি এক নয়। চীন ও বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ভারতে আছে। বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। চীনে গণতন্ত্র নেই। দেশটি কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত এবং সেখানে বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস, তাও, সিন্টো ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় বহু গুণে বেশি। তাছাড়া সেখানকার মুসলমানগণ কঠোর নিয়ন্ত্রণে আছেন। যা ভারতে নেই। অতএব চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদ্বারা জনসংখ্যার বৃদ্ধি আটকানোতে কোনও সমস্যা নেই। এবং ধর্মীয়

জনগোষ্ঠীসংখ্যা পরিবর্তনের ফলে কোনও সমস্যার আশঙ্কাও নেই। শরিয়ত বিধি অনুযায়ী মুসলমানের ৪টি বিবি রাখার আইন সেখানে অচল।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকলেও দেশটি ইসলামিক স্টেট। রাষ্ট্রধর্ম- ইসলাম। শরিয়তি আইন বিরুদ্ধ কোনও আইন সেখানে অসম্ভব। সর্বোপরি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি জনসংখ্যা সেখানে খুবই নগণ্য। এবং মুসলমানদের মতো তারা আগ্রাসী ও জঙ্গি নয়। তাঁরা কোনও ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোনদিন করেনি এবং করবেও না। বাংলাদেশে অমুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা একেবারেই নেই। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোনওভাবেই সেখানে মুসলমান প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করবে না।

এবার ভারতের কথায় আসি। ভারত হিন্দু-প্রধান দেশ হলেও এখানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দুরা প্রধানত অসাম্প্রদায়িক, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় (আসলে ভীরু)। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিন্দুরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও মুসলমানরা ধর্মীয় অনুশাসনের অজুহাতে ও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তা করে না। শরিয়ত বিরোধী বলে একটি বিয়ে করার আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একজন মুসলমান একই কালে চারজন স্ত্রী এবং যখন তখন তালাক দিয়ে চারটির মধ্যে সীমিত রেখেও অজস্র বিবি গ্রহণ দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত সন্তান জন্ম দিয়ে জ্যামিতিক হারে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন, যা গণতান্ত্রিক ভাবেই দেশে ইসলামিক শাসন কায়েম করতে পারে। ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা কী হবে সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর ইসলামি দেশগুলি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে, অপর ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তা ইত্যাদি সেখানে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যা গণতন্ত্রের প্রতিকূল।

অতএব সেই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ঠেকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেকুলারিটির নামে এক আহাম্মকি ব্যবস্থা চালু রেখে কিছু দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতালোভী রাজনীতিক সেই ভয়াবহ ভবিষ্যৎকে ত্বরান্বিত করছে।

—**কমলাকান্ত বণিক,**
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

বাংলাদেশে হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন

এবারের নির্বাচনে হিন্দু ভোট বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে চলেছে। যদিও প্রতিবারেই পর্যায়টা একই সীমার মধ্যে থাকে। তবে এবারের ভাবটা দেখে মনে হচ্ছে সব দলই হিন্দুদের খুব কাছে টানার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভোটের পরে হিন্দুদের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে এদের বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। সেদিন দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লববাবু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদের সবাইকে নিয়ে একটি ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আরও কাছে এসেছেন এই বার্তা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবাইকেই গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেন। সেই জন্যেই বেশিরভাগ দেশের সঙ্গে ভারতের খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম শুধু পাকিস্তান কারণ ওরা তো আমাদের ভালো চোখে দেখে না। যদিও হিন্দুদেরকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ খুব একটা পাত্তা দেয় না। এবার দেখে নিন এরা হিন্দুদেরকে কেমন ভালোবাসে তাঁরই দু-একটি চিত্র। বাংলাদেশে একটি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই খেলায় ভারত জিতেছিল। তখন ক্যাপ্টেন ছিলেন আজাহারুদ্দিন। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা। তিনিই টিভির সাক্ষাৎকারে ক্রিকেটের ফলাফল বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘সবই ভালো লাগছে কিন্তু একটা হিন্দুর হাতে পুরস্কার তুলে দিতে হচ্ছে এটাই খুব খারাপ লাগছে’। এটা কি একটা দেশের প্রধানের বক্তব্য হতে পারে? এই শেখ হাসিনার সময় বি. সি. এস. পাশ একটা হিন্দু ছেলেকে একটা অফিস থেকে বলেছিল, ‘চাকরি? পালা শালা মালাউন ভারতে পালা, এখানে তোর কী?’ একথাটা পেয়েছিলাম একটা কাগজে। সবাই হিন্দুদের ভালোবাসে কিন্তু আমরাই খারাপ। এখন বর্তমানে বাংলাদেশে যা অবস্থা হয়েছে কোনো পাড়ায় যদি এক ঘর মুসলমান বসে তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা মসজিদ তৈরি করে এবং নিরন্তর চলতে থাকে আল্লার সাধনা। এরাই দল বেধে হিন্দু বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসে সন্ধার সময় শঙ্খ ধ্বনি না করতে। বেলা ১টা থেকে ২টো পর্যন্ত ঢাকের বাদ্য না বাজাতে, তাতে তাদের আল্লার সাধনায় ব্যাঘাত হবে। এটা ব্যাঘাত না হিন্দুদেরকে চাপে রাখা সেকথা বুঝতে নিশ্চয়ই কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। এমন মর্মস্পর্শী বার্তায় হিন্দুদের কি বাংলাদেশে থাকার ইচ্ছা জাগবে? তবু নেহাত দায়ে পড়ে থাকছে। সেই দড়িতে বাধা গোরুকে মালিক যেমন অন্যায় ভাবে প্রহার করে তেমনি হয়েছে হিন্দুদের অবস্থা। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? দেখতে দেখতে ৮.৫ শতাংশ কমে ৪ শতাংশে দাঁড়াবে। এই ৪.৫ শতাংশ মান সম্মান বাঁচাতে ভারতে মাথা গুজবে। বাকি ৪ শতাংশের ২ শতাংশ ধর্মান্তরিত হবে। আর বাকি ২ শতাংশ নামে হিন্দু হয়ে মুসলমানের দলে নাম লেখাবে। কিন্তু এছাড়া তো উপায় নেই। দেখতে দেখতে সংখ্যাটা শূন্যে দাঁড়াবে। এর প্রতিবিধান করার জন্য কোনও সরকারই কিন্তু এগিয়ে আসবে না। এমনকী কোনও মিডিয়াও হিন্দুর হয়ে লিখবে না। এভাবেই হিন্দুর সলিলসমাধি ঘটবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সঠিক খাদ্যাভ্যাস

ত্রিয়া সিংহ

মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে দু'টি বিষয় অপরিহার্য তার মধ্যে একটি হলো জল। যার অপর নাম জীবন। অন্যটি খাদ্য। কিন্তু আমরা বেশিরভাগই জানি না যে, এই জল ও খাদ্য প্রতিদিন ঠিক কতটা পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত।

আমরা তেষ্টা পেলেই জল পান করি, কিন্তু আমরা একদিনে কতটা জল পান করছি সেটা কেউ পরিমাপ করে দেখি না। সাধারণভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ লিটার জল পান করা আবশ্যক। এখন ভাবার বিষয় যে, জলটা আমরা পরিমাপ করব কীভাবে? এটা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। দু'টি দু'লিটারের বোতল যদি একদিনে শেষ করা যায় তাহলে ৪ লিটার জল পান করা সম্ভব। জল কিন্তু পান করতে হবে অল্প পরিমাণে, বার বারে। খেতে বসে তেষ্টা পাওয়া ভালো নয়। এটা পাকস্থলী গরম থাকার লক্ষণ। খাওয়ার সময় জল খেলে পাচকাগ্নি নষ্ট হয়ে যায়। সকাল-দুপুর-রাতের খাবারের এক ঘণ্টা আগে-পরে জল পান করা বিধেয়। নিয়ম মেনে জল পান করা হলো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।

এবার আসি খাদ্যের প্রসঙ্গে। মানুষের দেহে ক্যালোরি বা শক্তির চাহিদা মেটায় মূলত তিনটি উপাদান-- কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট। কার্বোহাইড্রেট হলো শক্তির প্রধান উৎস। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় উপাদান প্রধানত ধান, গম, ভুট্টার মতো খাদ্য থেকে পেয়ে থাকি। বলা হয়, ভাত খেলে ওজন বাড়ে অথবা সুগার বাড়ে। কিন্তু ভাত, রুটি বা চিড়ে একই প্রকার খাদ্য। সব কটিতেই সম পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা বিদ্যমান।

দেহ গঠনের জন্য যে খাদ্য উপাদানটি বিশেষভাবে জরুরি সেটি হলো প্রোটিন। আমাদের শরীরের ওজন অনুসারে কেজি প্রতি প্রত্যহ ১ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত। মানুষের শরীরের ওজনের প্রায় ১৫ শতাংশ প্রোটিন দ্বারা নির্মিত। প্রোটিনের প্রধান উৎস হলো বিভিন্ন রকমের ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। সব মানুষের পক্ষে মাছ-মাংস কিনে খাওয়া সম্ভব নয়, তাঁরা ডাল, ডিম, শামুক খেতে পারেন। এগুলি সহজেই সাধ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। এছাড়া দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বাড়িতেই তৈরি করে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা এই জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে যা আমাদের দেহের স্বাভাবিক প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখে।

ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় খাবারের উৎস হলো তেল, ঘি, মাখন, নারকেল , বাদাম ইত্যাদি। ফ্যাট জাতীয় খাবার হলো শরীরের জ্বালানি এবং শরীরের সঞ্চিত শক্তি। এই সঞ্চিত শক্তি কমে গেলেই শরীরে রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব শুরু হয়। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করতে সাহায্য করে ফ্যাট জাতীয় খাদ্য। আমরা প্রত্যহ রান্নায় যে পরিমাণ তেল ব্যবহার করি তা দেহে ফ্যাটের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

এছাড়াও আমাদের শরীরের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আরও দু'টি খাদ্য উপাদান ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি ও ফল খেতে হবে। প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে স্যালাড হিসেবে শশা, গাজর, পেঁয়াজ খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।
এছাড়া পেয়ারা, কলা, পাকা পেঁপে ইত্যাদি সহজলভ্য ফল খেতে হবে। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের দুধ, দই, ছানা, পনির ইত্যাদি বেশি খেতে হবে। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভেগেন তাঁদের তন্তু জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে। বর্তমানে শিশুদের পরিপূরক খাদ্য অর্থাৎ প্যাকেট ফুড বা হেলথ্ ড্রিংকস্ দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু শিশুকে যদি সুষম খাদ্য দেওয়া যায় তাহলে এসবের প্রয়োজন পড়ে না।

সঠিক খাদ্য নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক খাদ্যাভ্যাসও জরুরি। বেশিক্ষণ খালি পেটে না থেকে অল্প পরিমাণে বারে বারে খাবার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালীন ভ্রমণ অথবা যোগাসন ও খেলাধুলার অভ্যাস থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে, দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া মানুষ না খেয়ে মরে না; সঠিক খাদ্যাভ্যাস না থাকার ফলেই নানা রোগভোগেই অকালে মারা পড়ে।

(লেখিকা বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ)

রাষ্ট্রায় স্বাহা

বিজয় আঢ্য

বেশ কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি ছবি দেখেছিলাম। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় শচীন তেন্ডুলকর একশত সেঞ্চুরি করার পর ব্যাটটি আকাশের দিকে তুলে ধরে নিজের পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। পূর্ব-পুরুষদের তৃপ্ত করার জন্য আপন কর্মের মাধ্যমে এই যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তাই তর্পণ। বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রজাগরণের ক্ষেত্রে শ্রীগুরুজীর (এই নামেই তিনি পরিচিত। পুরো নাম মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর) মতো একজন দেবদুর্লভ চরিত্রের মানুষের উদ্দেশে এই তর্পণ। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের স্মৃতিচারণ তথা মূল্যায়নের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। গুরুজীর একটি পরিচিত ছবি আছে। দিল্লিতে দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে আয়োজিত যজ্ঞাগ্নিতে তিনি আহুতি দিচ্ছেন। ছবির নীচে লেখা— 'রাষ্ট্রায় স্বাহা। ইদম্ ন মম।' অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিতে তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন। একবার মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত 'যুগধর্ম' পত্রিকা তাঁর কাছ থেকে একটি শুভেচ্ছা বার্তা চেয়েছিল। শ্রীগুরুজী মাত্র তিনটি শব্দে তা লিখে পাঠালেন— 'ম্যাঁয় নেহি, তু।' এই একাত্মবোধের ভিত্তিতেই যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে জাগরণ হয়েছে। বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রজীবনের পুনরুত্থান এই একাত্মবোধের ভিত্তিতেই যাতে হয়, আজীবন তিনি সেই ব্রতে ব্রতী ছিলেন। ইতিমধ্যেই ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই 'শ্রীগুরুজী সমগ্র' নামে ১২টি খণ্ডে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং যতদিন যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে জানবার আগ্রহ যত বাড়ছে, সেই সূত্রে তার দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালকের ভূমিকাকে আতস কাঁচের তলায় এনে বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রীগুরুজীর যারা অনুরাগী, যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তারা একটি সংস্কৃত সুভাষিতের উল্লেখ করেছেন—

মানুষ্যে সতি দুর্লভা পুরুষতা পুংস্ত্বে পুনর্বিপ্রতা,
বিপ্রত্বে বহুবিদ্যতাতিগুণতা বিদ্যাবতোঽর্থজ্ঞতা।...
[সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারং (৩।১০৫০)]

—অর্থাৎ মনুষ্য জন্মই দুর্লভ, তাতে

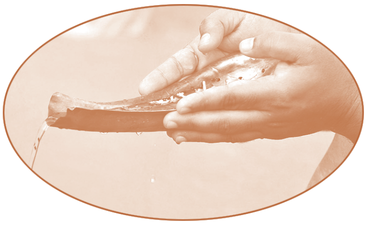

আবার পুরুষত্ব প্রাপ্ত হওয়া এবং বহুমুখী বিদ্যার্জন করা ক্বচিৎ সম্ভব হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে বিদ্যার অর্থ জানা এবং সেই জ্ঞান অপরকে দান করার সময় উচ্চস্তরের বাগ্মিতা ও ব্যবহার কুশলতার প্রকাশ, শুধু তাই নয়, সমস্ত শাস্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞ ওই ব্যক্তি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এমনটা হওয়া তো আরও কঠিন। এই সুভাষিত বর্ণিত অসামান্য গুণাবলী দেখে মনে হয়, সুভাষিতটি বোধ হয় শুধু শ্রীগুরুজীর জন্য লেখা হয়েছিল।

তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে সঙ্ঘের কলকাতা শাখার শিবির হচ্ছে। সময়টা ১৯৫৭-র ডিসেম্বর। কলকাতার দর্জিপাড়া শাখা থেকে গিয়েছি। সেই শিবিরে একটা পরীক্ষা হয়েছিল। আমাদের শাখার মুখ্যশিক্ষক বাচ্চুদা (প্রয়াত ভূমানন্দ পাল) বললেন, 'তোর চুল-দাড়িগুলো বেশ সুন্দর, এগুলো কাটিসনে যেন।' —একথা শ্রীগুরুজীকে কে বলেছিলেন?' —এটা জানিস? আমি না বলাতে বাচ্চুদা বললেন, শ্রীগুরুজীর গুরু স্বামী অখণ্ডানন্দ। সেই প্রথম শ্রীগুরুজীর কথা শুনলাম।

এরপর পাঁচ-ছ' বছর কেটে গেছে। তখন সোনারপুরে সবে শাখা শুরু হয়েছে। বাচ্চুদা বললেন, শ্রীগুরুজী কলকাতায় এসেছেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর (১৩.২.১৯৬৩) অনুষ্ঠান হবে। আমাদের যেতে হবে। সেই প্রথম দূর থেকে শ্রীগুরুজীকে দর্শন। এরপর অবশ্য শ্রীগুরুজীর দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি। কেননা বছরে দু'বার তো বটেই, তার বেশিও কলকাতায় এসেছেন আর কলকাতার কাছাকাছি থাকার সুবাদে তাঁকে দেখারও সুযোগ হয়েছে।

একটা মজার ঘটনা বলি। ১৯৬৮ সালে

হুগলী জেলার ইটাচুনাতে সঙ্ঘের একটা প্রশিক্ষণ শিবির হচ্ছে। সেবছর সঙ্ঘের অধিকারীদের দেখভালের দায়িত্ব ছিল। সেই শিবির পরিদর্শনে শ্রীগুরুজী এসেছেন। দিনটা বোধ হয় শিবিরে শ্রীগুরুজীর দ্বিতীয় দিন। বিকেলে প্রায় সবাই সঙ্ঘস্থানে চলে গিয়েছে। অধিকারী কক্ষটা ছিল একধারে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। বাইরে একটা চেয়ারে শুধুই শ্রীগুরুজী। দূর থেকে ব্যান্ড-বিউগিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মনোভাবটা আঁচ করে গুরুজী বললেন, তোমার গণবেশ আছে? সেই মুহূর্তে গণবেশ ছিল না। বললাম না। এর একটু পরে শ্রীগুরুজী ঘরের ভেতরে গেলেন। একটু পরেই দৃশ্যটা দেখলাম। তখন প্রশিক্ষণ বর্গে ছুরিকা (তরবারি) শেখানো হতো। একটি প্রয়োগ ছিল— দক্ষিণ স্কন্ধচ্ছেদ। অর্থাৎ শত্রুর ডান হাত কীভাবে ছেদ বা কাটতে হবে। ডান পা উঁচু করে ডান হাত গলার পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে শত্রুর দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে আঘাত করা। অবাক বিস্ময়ে দেখছি শ্রীগুরুজী ঘরের ভেতর সেটাই অভ্যাস করছেন। কেন করছেন--- এমন কৌতূহল থাকলেও জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই। তবে সেই কৌতূহলের নিবৃত্তি হতে দেরি হয়নি। সেদিন রাতে শিবিরের শারীরিক শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের বৈঠকে গুরুজী একজন প্রবীণ শিক্ষককে কীভাবে দক্ষিণ স্কন্ধচ্ছেদ করতে হয় তার বর্ণনা করতে বললেন। যিনি শিক্ষক তার কাছে এসব জলভাত। কিন্তু কী জানি কেন উত্তরটা বোধহয় একটু অন্যরকম হয়ে গেল। শ্রীগুরজী হো হো করে হেসে উঠলেন। বাকিরাও।

এই বৈঠকেই চিকিৎসা বিভাগের প্রমুখকে তার বিভাগ কী রকম কী চলছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তাঁর বিভাগের সব রকম চিকিৎসা পদ্ধতিরই ব্যবস্থা আছে। অ্যালোপাথি, হোমিওপ্যাথি, ন্যাচারোপ্যাথি...। গুরুজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সিমপ্যাথি? আবার হাসির রোল উঠল। এই যে প্রাণখোলা হাসি, হিউমার— বেদনার মধ্যেও রসের সন্ধান, শ্রীগুরুজীর স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য।

আর একটা ঘটনা মনে দাগ রেখে গেছে। সেটা ১৯৬৯ সাল। শ্রীগুরুজী কলকাতায় এসেছেন। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ঘনশ্যাম বেরিওয়ালজীর বাড়িতে রয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে আমরা বাংলার প্রচারকেরা সেখানে গিয়েছি। ছ-তলার ফ্ল্যাটে উঠে ডানদিকের ঘরটাতে গুরুজী আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন। বাংলার তখন যা প্রচারক সংখ্যা, ওই ঘরটিতেই এঁটে গেছে। সুজিতদা (ডাঃ সুজিত ধর) গুরুজীর ব্লাডপ্রেসার চেক করছেন। সেই সময় গুরুজী বলে উঠলেন, 'হম সব ইয়ে রাষ্ট্রপ্রবাহ কা এক এক বুঁদ হ্যায়।' না, এটা কোনও বৈঠকের বিষয় নয়, একেবারেই স্বগোতোক্তি। অন্য কেউ কথাটা তেমন ভাবে শুনেছে কি না জানি না, কিন্তু কথাটা মনে দেগে গেল। আজ এত বছর পরেও গুরুজীর সেই কথাটা মনের মধ্যে শুনতে পাই। বিশেষ করে, মনের ভেতর যখন 'আমি-আমার' দৈত্যটা লাফালাফি করে। ভারতবর্ষ জুড়ে এভাবে হাজার হাজার মানুষের মনে রাষ্ট্রহিতের যে প্রেরণা তিনি জাগিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর এই আত্মানুভূতি যা এই স্বগোতক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক হিসেবে ৩৩ বছর ধরে তিনি প্রতি বছর কমপক্ষে দু'বার সারা দেশ ভ্রমণ করেছেন। অসংখ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, অগণিত বৈঠক নিয়েছেন, কার্যকর্তাদের বাড়িতে থেকেছেন, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেছেন, অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থার অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছেন, বহু মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছেন, কথাবার্তা বলেছেন এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। অথচ এত উচ্চ কোটির মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন আমাদের নাগালের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে তিনি সন্ত কবীরের একটি দোঁহা-র উল্লেখ করে বলতেন— এমন বড় মাপের মানুষ হয়ে লাভ কী, যেমন তাল ও খেজুর গাছ, যারা না দেয় ছায়া আর না দেয় ক্লান্ত পথিককে ফল।

অথচ এমন একটি মানুষের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার তকমা লাগাতে দ্বিধা করেনি 'লিবারেল-লেফট, সেকুলার' পন্থীরা। কিন্তু মিথ্যা বেশিদিন ধোপে টেকে না। সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তার ক্রমপ্রসারমান প্রভাবই তাঁর মহত্ত্বকে দিন-প্রতিদিন উজ্জ্বল করে তুলছে। আর কে না জানে মহত্ত্বের মাপকাঠি হলো— 'The length of one's shadow on future!'

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN

করুন

উন্নতি করুন

DRS INVESTMENT

Contact :

9830372090

9748978406

Email : drsinvestment@gmail.com

uti UTI Mutual Fund

HDFC MUTUAL FUND

SBI MUTUAL FUND A partner for life.

অবনীন্দ্র-শিষ্য রেবতীভূষণ

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

“আমরা, আমাদের দাদামশায় অর্থাৎ ঠাকুরদা অবনীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকোর আদিবাড়ি থেকে বরাহনগর রোড স্টেশনের রেল লাইনের ধারে ‘গুপ্ত নিবাস’ বাগান বাড়িটিতে সপরিবারে ভাড়া নিয়ে উঠে আসি। সেটা বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের প্রথমাংশ। তার কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে গেছে।

গুপ্ত নিবাস ছিল বিরাট এক বাগান ঘেরা বাড়ি। মনে হয় সেটা হবে ১৯৪২ সালের কোনো এক বিকেল। একজন যুবক মুণ্ডিত মস্তক, সাইকেলে বাড়ির বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার একতলায় সিঁড়ির পাশে দেওয়ালের গায়ে সাইকেল রেখে হাজির। বারান্দায় একটা লম্বা টেবিল ও তার গায়ে একটা বসবার চেয়ার থাকতো। অতিথিদের বসার জন্য। আমি তখন এগারো বছরের বালক মাত্র। পরণে হাপ প্যান্ট, গায়ে হাতকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি। বাড়ির পোশাক পরে টেবিলের একপাশে বসে মাছ ধরার সরঞ্জাম ঠিক করতে ব্যস্ত, সামনের দণ্ডায়মান ছেলেটিকে বললাম— ‘বসুন, কী প্রয়োজনে আসা?’ যুবকটি চেয়ার টেনে এসে বললেন— ‘আমি গঙ্গার ওপারে বালি থেকে আসছি, অবনীন্দ্রনাথকে দেখতে ও দুই চারটি কথা বলতে।’ আমি বললাম— ‘এখন তো হবে না। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। তবে যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন তো দেখা হতে পারে, কারণ কিছুক্ষণ পরেই তিনি নীচে নাববেন।’ সেই শুরু এরপরে রেবতীবাবু ক্রমে ক্রমে আমাদের পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন যে মনে হতো পরিবারেরই একজন।”

শিল্পী রেবতীভূষণের ৮০তম জন্মবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই স্মৃতিচারণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় গুরু-শিষ্যের প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণটি। আসলে সদ্য পিতৃবিয়োগের পর মানসিক অবসাদ এবং শূন্যতা সাময়িক ভাবে ঘিরে ধরেছিল রেবতীভূষণকে। সেই হতাশা থেকে মুক্তি তিনি খুঁজেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। শুধু শিল্পশিক্ষা নয় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে গড়ে দিয়েছিলেন শিল্পবোধ। দেশজ এবং

প্রাচ্যকলাবিদ্যার ধারণা। নান্দনিক চেতনা এবং এক পূর্ণ জীবন বোধ।

গুপ্তনিবাসে প্রথম সাক্ষাতের দিনেই অস্বাভাবিক দ্রুততায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু-তিনটি স্কেচ করে ফেললেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে তাকে বললেন— ‘তুমি তো কুইক আর্টিস্ট হে’। নিজের পোর্ট্রেট দেখে খুশি হয়ে তার ওপরেই লিখেছিলেন— ‘বুড়ো আর্টিস্ট ধরা পড়েছে ছোকরা আর্টিস্টের ফাঁদে।’ এভাবেই তিনি ধরা পড়লেন অবনঠাকুরের স্নেহ প্রশ্রয়ের অমৃত জালে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন স্ত্রী বিয়োগের পর নির্জনতা বিলাসী। একাকিত্বই ছিল কাঙ্ক্ষিত। পারিবারিক নানা স্রোত-প্রতিস্রোতে তিনি ব্যথিত। পিতৃহারা রেবতীভূষণ দিশেহারা। খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোনো এক ‘নিমছায়া তীর’। জগৎ জুড়ে বিষাদ ঘেরা বাতাস। কোথাও নেই স্নেহের পরশ। সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথ খুঁজে নিলেন তাঁর শেষতম শিষ্যটিকে।

জল রং, ওয়াশ টেকনিক, প্যাস্টেল, চীন এবং জাপানের শিল্পরীতি, শেখাতে লাগলেন। কবজির নয়, বাহুর জোরে চীনা শিল্পীরা কীভাবে ছবির মধ্যে গতিময়তা সৃষ্টি করে তা হাতে ধরে শিখিয়ে দিলেন রেবতীভূষণকে। সিল্কের এক টুকরো সেঁটে দিলেন খাতার পাতায়। পাশে জলরঙে এমন নকল করতে বললেন যে হাত না বুলিয়ে কেউ টের যেন না পায়। সঙ্গে চলল কুটুম-কাটুমের স্কেচ, আর পোর্ট্রেট আঁকার কায়দা কানুন শিক্ষা। আসলে শুধু শিল্পচর্চা বা শিল্পশিক্ষা নয় শিল্পগুরু ছিলেন রেবতীভূষণের জীবনের ধ্রুবতারা।

মাঝেমধ্যেই দীর্ঘ সময় ধরে চলত দুই অসম বয়সীর আড্ডা। তাঁর নাতি-নাতনিরা এ বিষয়ে আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ করলে, অবনীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বলতেন— ‘এদিকে আসিস না, এখানে হাসিসের আড্ডা বসেছে।’ সেই হাসিসের আড্ডার আশিসেই ধন্য হয়েছিলেন রেবতীভূষণ। কার্টুনিস্ট হয়েও তাই তার তুলির টানে মূর্ত হয়ে উঠত হিন্দু পুরাণ আর বৌদ্ধ জাতকের প্রসঙ্গ। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তার ঐতিহ্যকে আর কেউ এত নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। এদিক থেকে তিনি অনন্য। আর এই অনন্যতার কারণ অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিতৃহীন রেবতীভূষণের গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথ। তার জীবনের খরদীপ্ত প্রহরে দান করেছিলেন স্নেহচ্ছায়া। শিল্পসাধনায় ব্যাঘাত ঘটছে, অতএব সওদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি রেবতীভূষণ চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন। এ.জি বেঙ্গলের চাকরি ছাড়ার কথা জানালেন অবনীন্দ্রনাথকে। শুনেই হেসে উঠলেন শিল্পগুরু। নাতি বাদশা ঠাকুরকে ডেকে বললেন— ‘শোন শোন বাদশা রতন বলে কী? ওর নাকি মেলা টাকাকড়ি। চাকরি ছেড়ে দেবে, তা তোমার টাকাপয়সার কিছু আমায় দিও না।’ তারপর কাছে টেনে নিলেন তার স্নেহের ‘রতন’ কে। ‘রতন’ রেবতীভূষণের ডাকনাম, তাঁর মা তাঁকে ওই নামে ডাকতেন আর গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথও। রতনকে ডেকে উপদেশ দিলেন চাকরি ছাড়ার নাম করবে না। যেখানেই যাবে সেখানেই বৈচিত্র্য খুঁজে নেবে। চোখ কান খোলা রাখবে। দেখবে মানুষকে। তাদের মুখ, অভিব্যক্তি, ভঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করবে। সেই শিক্ষাই রেবতীভূষণকে পরবর্তী জীবনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শিল্পী যে, তাকে দেখতে হবে সজাগ এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে হবে চারপাশকে।

(লেখক প্রাবন্ধিক, পেশায় শিক্ষক, রেবতীভূষণের শেষ জীবনের সঙ্গী)

মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন

জিষ্ণু বসু

ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে কেবলমাত্র ইংরেজি জানা কেরানি বানালে চলবে না, প্রয়োজন বিজ্ঞান প্রযুক্তির চর্চা। এই ভাবনা থেকেই দেশপ্রেমিক প্রবুদ্ধ মানুষেরা তৈরি করেছিলেন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন বেঙ্গল' যার প্রথম আচার্য ছিলেন স্বয়ং ঋষি অরবিন্দ। এই কাউন্সিলের অধীনে তৈরি হলো দুটি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি মেডিকেল কলেজ যেটা পরবর্তীকালে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। আর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সেই কলেজই আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই কাজে যে দুজন অধ্যাপক দিবারাত্র মগ্ন ছিলেন তাঁরা হলেন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অমিতাভ ভট্টাচার্য আর গোপাল চন্দ্র সেন।

গোপালচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ জেলার বালিয়া গ্রামে জন্ম ১৯১১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। গরিব ঘরের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন চাকরিসূত্রে ৩০০ কিলোমিটার দূরে রংপুরে গিয়েছিলেন। সেখানের কৈলাসরঞ্জন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। গোপালচন্দ্র সেনও ওই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। কারমাইল কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে আইএসসি পাশ করে যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে ভর্তি হন। তার পরের বছরই বাবা নগেন্দ্রনাথ প্রয়াত হন। পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব তখন গোপালচন্দ্রের উপর এল। কলেজের পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ায় একটা কারখানাতে কাজ নিতে হলো তাঁকে। চলল কঠোর জীবন সংগ্রাম।

দেশাত্মবোধ গোপালবাবুর রক্তে ছিল। মামা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীবাদী ছিলেন। কলেজে তৃতীয়বর্ষে পড়ার সময়ই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে মেদিনীপুরের গড়বেতায় লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আবার স্বদেশি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে যাদবপুর থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্নাতক হলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রিয় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইন্সট্রাক্টর হিসাবে চাকরি পান তিনি। ১৯৪২ সালে তিনি যাদবপুরে লেকচারার হিসেবে জীবন শুরু করলেন। লেকচারার হয়ে বছর চারেক চাকরি করার পর তিনি বিদেশে উচ্চশিক্ষা নেবার জন্য বৃত্তি পান। ১৯৪৬ সালে মাস্টার অব সায়েন্স অধ্যয়নের জন্য আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানেই আমেরিকার 'প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারিং' বিদ্যার জনক বলে কথিত অধ্যাপক বোস্টনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে যুগে স্ট্যাটিসটিকাল কোয়ালিটি কন্ট্রোলের আগমনে প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষা অঙ্গন উদ্বেলিত। বোস্টনের সঙ্গে সেই গাণিতিক মডেল আর তার স্টিমুলেশনের কাজে মগ্ন হয়ে যান গোপালচন্দ্র। অধ্যাপক বোস্টনের তখন খুব নাম ডাক। আমেরিকার শিল্পজগৎ বুঝে গেছে যে ত্রুটিমুক্ত মাস প্রোডাকশনের জন্য স্ট্যাটিসটিকাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল এক অপরিহার্য বিদ্যা। তাই ভুবনবিখ্যাত ইলেকট্রিকাল মোটর তৈরির কোম্পানি জেনারেল মোটরস উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেছিল অধ্যাপক বোস্টনকে। সেই সুবাদে অধ্যাপক বোস্টনও গোপালচন্দ্র সেনের নাম সুপারিশ করেছিলেন জেনারেল মোটরসে স্থায়ী চাকরির জন্য। কিন্তু তখন গোপালচন্দ্র সেনের মনের মধ্যে চলছে প্রবল ঝড়। সম্পূর্ণ স্বদেশি ভাবনায় বড় হওয়া, আপাদমস্তক এক দেশপ্রেমিক মানুষের সামনে স্বাধীন ভারতকে গড়ার স্বপ্ন--- বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়,

স্বাদেশিকতায়। দেশে ফিরে তিনি যাদবপুর প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজে মন দিলেন। নেতৃত্বে ত্রিগুণা সেন। কিন্তু প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে মডেল তৈরি করেছিলেন অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য, গোপাল চন্দ্র সেনেরা সেটা সত্যিই অভিনব। গোপালবাবুর অক্লান্ত সারস্বত সাধনার ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল স্বাধীন ভারতে কারিগরি শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান। ১৯৭০ সালের ১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব প্রদান করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এটা মেনে নিতে পারেনি। সে বছরই ৩০ ডিসেম্বর তাঁর চাকরি জীবনের শেষ দিনে অতিবাম বিপ্লবী রাণা বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই তাঁকে খুন করল। এই স্বদেশপ্রেমী, শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী নির্ভীক মানুষটিকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

(লেখক সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রযুক্তিবিদ)

আমার সুপ্রিয়া-তর্পণ

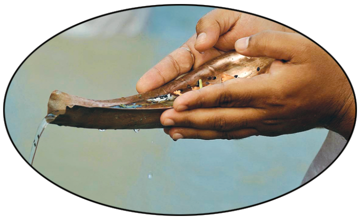

লকেট চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রিয়া দেবী শুধুমাত্র এক সুন্দরী অভিনেত্রীর নাম নয়। একটি যুগেরও নাম। আর সুপ্রিয়া দেবীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া মানে একটি যুগের তর্পণ। এই যুগের শুরু ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে-ঢাকা-তারা'য়। যে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবী। সুপ্রিয়া দেবী মেঘে ঢাকা তারা হয়ে কিন্তু থাকেননি। ক্রমে রূপ-অভিনয়-সাধনা ও শ্রমের সাহায্যে হয়ে উঠলেন বাংলা ছবির সুপারস্টার!

সময়টা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেটা সুচিত্রা-উত্তমের যুগ। একটার পর একটা বাংলা ছবিকে এরাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সুপারহিট সাফল্যে ও বাণিজ্যে। হঠাৎ সেই সময় এলেন সুপ্রিয়া দেবী! এবং এলেন এমন একটি ছবিতে যেটি রোমান্টিক বা মূল স্রোতের ছবি নয়। এ ছবিতে আমরা যে-সুপ্রিয়াকে পেলাম তিনি গ্ল্যামারবিহীন, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছেন। এ ছবি দারিদ্র্যের। এ ছবি কঠোর বাস্তবের। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সুপ্রিয়া দেবীই হয়ে উঠলেন বাংলা সিনেমার গ্ল্যামাররঞ্জিত রোমান্টিক নায়িকা। কেউ কেউ তাকে বলতেন, টালিগঞ্জের সোফিয়া লোরেন। তবে তিনি ছিলেন আমাদের সকলের বেনুদি।

তিনি সাফল্যের এবং জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছেছিলেন সুচিত্রা সেনকে পাশ কাটিয়ে। সরাসরি কোনো প্রতিযোগিতায় গেলেন না। তিনি নিয়ে এলেন উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের ভিন্ন রসায়ন অন্য আন্তরিকতা। একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, সুপ্রিয়া দেবী সেই বাংলা নায়িকা যিনি সুচিত্রা সেনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন স্বকীয় শৈলীর ঘরানা।

সুপ্রিয়া দেবী নিয়ে এলেন আধুনিক তৎপরতার সেই গতি ও নতুনত্ব, যা বাংলা ছবিতে, বিশেষ করে রোমান্টিক ছবিতে ছিল না। তৈরি করলেন স্বকীয় আবেদন। সুচিত্রা সেন-উত্তম কুমারের যুগে মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে এই নবরসায়ন, এই ভিন্ন ঘরানা নিয়ে আসা সহজ কাজ ছিল না। সুপ্রিয়া দেবী সেই কাজটি কত সহজে, সাবলীলতার সঙ্গে একের পর এক ছবিতে করেছেন। 'শুন বরনারী' এমনই এক সুপারহিট ছবি। যে ছবিতে ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবীর সমন্বয় আমাদের চমকে দিয়েছিল। আমরা বুঝতে পারলাম, বাংলা রোমান্টিক সিনেমার নতুন যুগ শুরু হলো। এবং নতুন রোমান্টিক জুটির নাম সুপ্রিয়া-উত্তম। তারপর দেখলাম 'চিরদিনের' নামের একটি ছবি। উত্তম-সুপ্রিয়া জুটির যেন ভিন্ন মাত্রায় উত্থান হলো। 'অগ্নিপরীক্ষা' সুচিত্রা-উত্তমের সুপারহিট ছবি। আর সুপ্রিয়া-উত্তম জুটির সুপারহিট অভিনবত্ব প্রকাশ পেল 'অগ্নিসংস্কার' ছবিতে। 'উত্তর-মেঘ' আরও একটি ছবি যাতে সুপ্রিয়া দেবী অবিস্মরণীয় অভিনয় করলেন। 'জীবনজিজ্ঞাসা'-তেও সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয় ভুলতে পারিনি। বেশ বুঝতে পারলাম সুপ্রিয়া দেবী এই নতুন যুগের মধ্যমণি। 'সূর্যশিখা'-র সুপ্রিয়া দেবীকেই বা সহজে ভুলি কী করে? কী নিয়ন্ত্রিত সংযত অভিনয়। এবং কী অসাধারণ উপস্থিতি দৃশ্যের পর দৃশ্যে। সত্যিই যে 'সূর্যশিখা' তিনি! বিশেষভাবে মনে পড়ছে 'মন নিয়ে' ছবির কথা। মনের নানা চোরাস্রোত নিয়ে এই ছবি। মানুষের মনোভুবনকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। সেই কঠিন কাজটা কী বিস্ময়কর সাবলীলতার সঙ্গে করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের ছবি সুপ্রিয়া-উত্তমের 'বাঘবন্দি খেলা'। এ ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী তার অভিনয়ে নিয়ে এলেন উত্তমকুমারকে চ্যালেঞ্জ জানানো ব্যক্তিত্ব। 'বাঘবন্দি খেলা' জনপ্রিয়তম ছবির একটি। 'উত্তরায়ণ' আরও এক উত্তম-সুপ্রিয়ার সুপারহিট। শেষে ভুলতে না পারা আরও দুটি সুপ্রিয়া-উত্তম সুপার-সাফল্যের কথা বলি। তুলনাহীন সুপ্রিয়া দেবীকে জানতে 'লালপাথর' ও 'শুধু একটি বছর' এই দুটি ছবি দেখতেই হবে। সুচিত্রা সেনের পর বাংলা ছবিতে এমন গ্ল্যামারাস নায়িকা আর আসেননি।

কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা মানুষ সুপ্রিয়া দেবী, যিনি সকলের বেনুদি। যে-ভালবাসা, আন্তরিকতা, দিদির মতো ব্যবহার তার কাছ থেকে চিরদিন পেয়েছি, আমার সুপ্রিয়া-তর্পণের সেইটাই শেষ কথা হয়ে রইল। তিনি যতবড় অভিনেত্রী ছিলেন, ততই বড়োমনের মানুষ ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা, সুবাস ও অবদান একটি যুগের সবটুকু আচ্ছন্ন করে আছে। তাঁর আত্মা শান্তি যেন পায়, এই আমাদের কামনা।

(লেখিকা রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী)

আমার দ্রোণাচার্য গোষ্ঠপাল

কল্যাণ চৌবে

আমরা যারা মাঠে মানুষ হয়েছি; যারা স্বপ্ন দেখেছি ম্যাচগুলো জেতার; প্রতিপক্ষের সমস্ত আক্রমণ রুখে দিয়ে প্রতি আক্রমণের মাঝ মাঠ থেকে বল তরতর করে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিখেছি; তাঁদের এক ঈশ্বরের নাম গোষ্ঠ পাল। পেশাদার ফুটবলে এসে কলকাতার প্রায় নামজাদা সব ক্লাবেই ঢুঁ মেরেছি। জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে নানান স্টেডিয়ামে আমার ছড়ানো অভিজ্ঞতা। শুধু কলকাতার মাঠ নয় গোয়ার মাঠেও আমার অনেকটা সময় কেটেছে। দেশি বিদেশি অসংখ্য ভালো ফুটবলারের সান্নিধ্য পেয়েছি। শিখেছি অনেক কিছুই। কিন্তু আকাশবাণীর সামনে দিয়ে গেলে এখনও গোষ্ঠ পালের দৃপ্ত মূর্তিটার সামনে দাঁড়াতেই হয়। মাথা নুইয়ে যায় শ্রদ্ধায়। মাথা তোলার সাহসও জোগান গোষ্ঠ পাল। তর্পণ যদি কারও করি আমি, অবশ্যই গোষ্ঠ পালের তর্পণ করি। যদিও এই মহান মানুষটিকে আমি কোনওদিন সামনে থেকে দেখার সুযোগ পাইনি। ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে আমি জন্মেছি। আর তার আগের বছর ৮ এপ্রিলে আমাদের সকলকে গোল দিয়ে চলে গেছেন গোষ্ঠ পাল। সে মহাপ্রস্থানের ন' বছর পর কলকাতার মাঠ আগলে এই মূর্তিটি দাঁড়িয়েছে। তখন আমার বয়স বছর আটেকের। উল্টোডাঙার ছেলে। ফলে বড়দের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া মানে গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর শীতের চড়চড়ে রোদে পিঠ দিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে সাদা জামা পরা দাদাদের ক্রিকেট। টেস্ট ক্রিকেট। আমাকে প্রথম থেকেই ফুটবলই টানত। একটু এগোলেই কাঠের পাঁচিল ঘেরা সবুজ মেরুন তাঁবু। মোহনবাগান ক্লাব। পাশেই লালে হলুদে ইস্ট বেঙ্গল। আমাদের ছোটোবেলা মানে দুই দলের দারুণ লড়াই। উপভোগ্য বিরোধিতা। খেলা মানেই আকাশবাণীর সরাসরি সম্প্রচার। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে সকলের কানে কানে ট্রানজিস্টার। বিকাশ পাঁজি, চুনি গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জি— তারায় ভরা ময়দানের আকাশ।

১২ বছর বয়সে টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে যখন যাই, খেলাটা শিখতে, ভালো করে শিখতে, তখন আমাকে আমার কলকাতার ময়দান প্রেরণা দিত। কঠিন প্রশিক্ষণের মধ্যেও সাহস আর হিম্মত দিতেন ময়দানের চীনের পাঁচিল গোষ্ঠ পাল। কেননা এখনও মনে আছে ছোটোবেলায় ময়দানে গেলে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে এমন ভাবে দাঁড়াতাম যেন আমি আমার ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছি। মাথা নুইয়ে আসত শ্রদ্ধায়। বাবার কাছে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের, কাকা জ্যাঠাদের কাছে শুনে শুনে অপার শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তাই ময়দানে গেলে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে দাঁড়ানো আর প্রণাম করাটা আমার রুটিন ছিল। তীর্থভ্রমণের আনন্দ পেতাম। ফুটবলের প্রতি যেটুকু নিষ্ঠা তার অনেকটাই গোষ্ঠ পালের দেওয়া। সেইসঙ্গে পেয়েছি আক্রমণ রুখে দেওয়ার হিম্মত। প্রতি-আক্রমণ করার হিম্মত। আর কঠিন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ— এসব দিয়েই গোষ্ঠ পাল আমার মেন্টর। একলব্যের মত তাঁর কাছ থেকে শিখেছি যার কোনও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না।

১৯১১ সালের ঐতিহাসিক জয়ের পর ১৯১২ সালে কলকাতার ময়দানে পা রাখেন এই মহান ফুটবলার। ১৮৯৬ সালের ২০ আগস্ট জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরের একটি ছোট্ট গ্রাম ভোজেশ্বরে। তারপর কলকাতায় ফুটবল খেলতে আসা। মোহনবাগানে খেলার সুযোগ পাওয়ার পর কখনও দল বদল করেননি। সেই সব সময় দেশের স্বাধীনতার লড়াইটা ময়দানে লড়ত বাঙ্গালি। যুদ্ধং দেহি মানসিকতা নিয়ে ফাউল না করে ব্যাকরণ মেনে সাহেবদের মুখের ওপর জবাবটা দিতেন তিনি। অদম্য তাঁর মনোবল। ক্যালকাটা ক্লাব, উরস্টার্স, নর্থ স্ট্যাফর্ড, লিস্টার্স, মিডলসেক্স, হাইল্যান্ড ইনফ্যান্ট্রি— প্রায় সবার বিপক্ষেই মোহনবাগান তীব্র লড়াই গড়ে তুলেছিল। সেই লড়াইয়ের পুরোভাগে ছিলেন গোষ্ঠ পাল। মগজ দিয়ে ফুটবল খেলার এক অসামান্য ঘরানা তৈরি করেন তিনি। সাহেবরা পরাজয়ের প্রত্যুত্তরে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করতে শুরু করে। এই অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করে গোষ্ঠ পাল মাথা উঁচু করে খেলা ছেড়ে দেন। আর বাঙ্গালিকে শিখিয়ে দিয়ে যান শিরদাঁড়াটা আমাদের, তাঁকে নুইয়ে দেওয়ার অর্থ হলো মৃত্যু।

(লেখক ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক)

স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দিনের সম্পাদক সত্যেন মজুমদার

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

গত শতাব্দীর দুই-তিনের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকার বর্মন স্ট্রিটের অফিসে প্রায় দিনই জমজমাট আড্ডা বসত। সারাদিন অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি, রিপোর্টার আর সম্পাদকীয় ডেস্কের ব্যস্ততা। তারপর বিকেলের দিকে ফুরসত মিললেই সম্পাদকের ঘরে গুটি গুটি হাজির হতেন কলকাতার নানা বিশিষ্ট মানুষ। বিকেল গড়িয়ে ক্রমশ সন্ধে। বড় ঠোঙায় করে ঢুকত মুড়ি-বাদাম, তেলেভাজা। সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে চা। আড্ডা ততক্ষণে জমে উঠেছে। সেই আড্ডার মধ্যমণি, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম কর্মী-সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। যেমন তাঁর দরাজ গলা, তেমনি হো-হো হাসি। কোনও বিষয় নিয়ে শুরু করলে কথা যেন থামতেই চাইতো না। আর সেইসব কথা শুনে মুচকি মুচকি হেসে চলেছেন প্রফুল্লকুমার সরকার— আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তবে তাঁর মুখ দিয়ে বড় একটা মন্তব্য বেরিয়ে আসত না। উপভোগ করতেন। সত্যেনবাবুর কথায় যোগ দিতেন না।

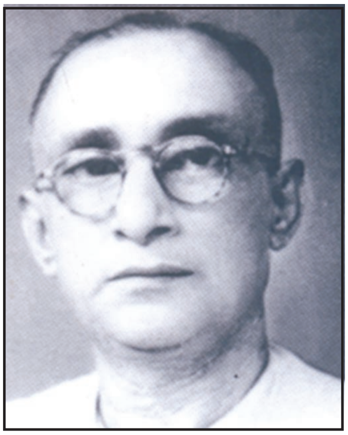

১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর 'বাঙ্গালি বীর যতীন্দ্রমোহন' শিরোনামে আনন্দবাজারে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বেরনো মাত্রই তৎপর হয়ে ওঠে ব্রিটিশ পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার ও মুদ্রক অধরচন্দ্র দাসকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। অগ্রাহ্য করা হয় তাঁদের জামিনের আবেদনও। সুরেশ মজুমদার কাগজের দৈনন্দিন কাজে সময় দিতে না পারলেও নানা সূত্রে খবর নিয়ে ভালো ভালো সংবাদকর্মীদের আনন্দবাজারে নিয়ে এসেছিলেন। যাঁদের মেধা, নিষ্ঠা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাগজ। এমনই একজন সত্যেন মজুমদার। জলপাইগুড়ির যুবক সত্যেন্দ্রনাথের পিতৃভূমি ছিল ময়মনসিংহ। কম বয়স থেকেই নানা বিষয়ের ওপর লিখতেন সত্যেন্দ্রনাথ। বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে তাঁর একের পর এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ পাঠকমহলে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, সুরেশ মজুমদারও তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সত্যেনবাবু কাজ করতেন দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায়! সুরেশ মজুমদার একদিন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বর্মন স্ট্রিটের সম্পাদক দপ্তরে। আলাপ হলো প্রফুল্ল সরকারের সঙ্গে। আনন্দবাজারে যোগ দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেটা ১৯২২ সাল। মাত্র এক বছরের মধ্যেই প্রফুল্ল সরকারের অনুরোধে কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন সত্যেন্দ্রনাথ। মুক্তি সংগ্রামের দোসর ও সমর্থক আনন্দবাজারের প্রতিবেদন আর সম্পাদকীয়র ঝাঁঝ একই রকম রইল। বরং দিনে দিনে তা যেন আরও বাড়তে লাগল। একদিকে যুগান্তর-অমৃতবাজার, অন্যদিকে আনন্দবাজার। এই দুই পত্রিকাগোষ্ঠীর দাপটে ইংরেজ গভর্নমেন্টের তখন রাতের ঘুম উড়ে গেছে। ১৯২৭ সালের ২৫ জুলাই আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে আবার এক গুরুতর অভিযোগ নিয়ে এল সরকার। সম্পাদক সত্যেন মজুমদার যাতে আইনের জাল কেটে বেরোতে না পারেন সেজন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭ ও ১৪৮ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল পুলিশ। তারপর অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। সে-যাত্রা বেশ কিছুদিন জেলে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তা বলে আনন্দবাজারের দৈনন্দিন কাজকর্ম বা প্রকাশনা এতটুকু টাল খায়নি। সম্পাদক কারারুদ্ধ, কিন্তু আনন্দবাজার আছে আনন্দবাজারেই। প্রতিটি খবরের নৈর্ব্যক্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টিং। আর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় আগুনের আঁচ। ১৯২৯ সালের শেষদিকে বিশেষ এক কংগ্রেস সংখ্যা বের করে আনন্দবাজার। সেখানে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিষিদ্ধ আন্দোলন নিয়ে এমন প্রবন্ধ প্রকাশ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি গভর্নমেন্ট। সরাসরি রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হলো সম্পাদক সত্যেনবাবুর নামে। জরিমানা এক হাজার টাকা, অনাদায়ে এক মাস কারাদণ্ড। সে বছর ৩১ ডিসেম্বর পুলিশ ঢুকে পড়ল পত্রিকা অফিসে। দিনভর চলল খানাতল্লাশি। শেষে কংগ্রেস সংখ্যার অবিক্রিত কপিগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল তারা। কিছুদিন পর এই সংখ্যা প্রকাশের অপরাধে ফের ৬ মাসের জন্য সম্পাদককে জেলে ঢোকাল সরকার। পরের বছর ১৯৩১ সালে আবার এক অজুহাতে আনন্দবাজার সম্পাদককে জেলে পুরল গভর্নমেন্ট। সময় এবার আরও বেশি, ৯ মাস।

দু' দফায় মোট সতেরো বছর আনন্দবাজারের সম্পাদক ছিলেন সত্যেন মজুমদার। বারবার ইংরেজ সরকার তাঁকে জেলে পুরেছে, অপমান করেছে, জরিমানা করে জেরবার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একদিনের জন্যেও বাগে আনতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শোকার্ত আনন্দবাজার লিখল : ''জাতির অসার দেহে প্রাণস্পন্দন আনিয়া দিবার জন্য তাঁহার অগ্নিবর্ষী লেখনী শুধু আগুনের হলকাই ছড়ায় নাই... মিথ্যা, ভণ্ডামি ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার শ্লেষাত্মক সার্থক রচনা বিস্মৃত হইবার নহে।... বাংলা সংবাদপত্র জগতে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান আর পূরণ হয়ই না। সত্যেন্দ্রনাথের বিয়োগে সংবাদপত্র জগত কী হারাইল, কতটা হারাইল, তাহার পরিমাপ করিবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ।''

ঋণ : রমেশচন্দ্র মজুমদার, পরিমল গোস্বামী, ইন্দ্র মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ***(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)***

গুরু কেলুচরণ একাধারে আমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর

অলকা কানুনগো

গুরু শব্দটি আক্ষরিক অর্থে যথেষ্ট ওজনদার। ভারতীয় পরম্পরায় গুরু একজন আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিক্ষক। গুরু আমাদের শরীর গঠন করে দেন, মন পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করেন এবং আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করেন। সূর্য যেমন কখনও আলো এবং শক্তি দেওয়া বন্ধ করে না, ঠিক তেমনি গুরুও সকলকে সমান চোখে দেখে নিরন্তর জ্ঞান বিতরণ করে যান। আমার গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র ছিলেন এমনই একজন দেবতাপ্রতিম মানুষ।

আমার কাছে তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। তিনি শুধু অসাধারণ কিছু নৃত্যশৈলীই উদ্ভাবন করেননি, তৈরি করে গেছেন এমন কিছু যুগন্ধর শিষ্য-শিষ্যা, যাঁরা তাঁর নৃত্যদর্শনকে ভাবীকালের রাজদরবারে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তিনি আমার বিষ্ণুও। কারণ তাঁর জ্ঞান আমাদের লালন পালন করেছে। আবার তিনি মহেশ্বরও। দুর্দমনীয় সংহারক। আমাদের নৃত্যের এবং চরিত্রের সামান্যতম স্খলনও তিনি বরদাস্ত করতেন না। মহেশ্বরের মতো তিনিও আমাদের তমসা নাশ করতেন, যাতে আমরা কলুষমুক্ত হয়ে সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারি। পরমব্রহ্মের মতো তিনিও ছিলেন স্বশিক্ষিত, বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সহজ সরল একজন মানুষ। আমার মতো বহু নৃত্যশিল্পীর পথপ্রদর্শক। প্রথম দিকে আমি তাঁকে কেলুস্যার বলে ডাকতাম, কিন্তু কালক্রমে তিনি স্যার থেকে গুরুজী হয়ে উঠেছিলেন।

একজন সরল মানুষকে নিয়ে লেখা সহজ নয়। কত কথা, কত ঘটনা— তার মধ্যে থেকে কিছু বেছে নেওয়া বেশ কঠিন। এখানে আমি দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

একবার কুলটিতে আমাদের একটা অনুষ্ঠান ছিল। উদ্যোক্তারা মেয়েদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু পুরুষদের মেঝেতে শোবার কথা বলা হয়েছিল। ব্যাপারস্যাপার দেখে আমাদের খুবই খারাপ লাগল। আমরা গুরুজীকে মেঝেতে না শুয়ে কোনও একটা ঘরে শোবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু গুরুজী বললেন,

'বাড়িতেও তো আমি মেঝেতে শুই।' আমরা জানতাম মেঝেতে শুলে গুরুজীকে উদ্যোক্তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে শুতে হবে। তাই বললাম, 'তা বলে আপনি এদের সঙ্গে শোবেন?' এবারও গুরুজী নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে! ওদের সঙ্গে শুলে ওরা আমার খেয়াল রাখতে পারবে।' গুরুজীর কোনও ইগো ছিল না। কোনও অযৌক্তিক দাবি বা ওপরচালাকিও না।

দ্বিতীয় ঘটনাটির কেন্দ্র জাপানের রাজধানী শহর টোকিও। সেবার ওখানে ভারত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারত এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ওটা ছিল আমার জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। তখন আমি ঘুঙুর বাঁধতে পারতাম না। গুরুজী বেঁধে দিতেন। কিন্তু সেবার গুরুজী আমার মেকআপ করে দিলেও ঘুঙুর বেঁধে দেবার সময় পাননি। অন্য একজন বেঁধে দিয়েছিলেন। নাচ শুরু করার পরেই টের পেলাম বাঁধা ঠিকমতো হয়নি। প্রতিটি পদক্ষেপে বাঁধন একটু একটু করে আলগা হয়ে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে সম্পূর্ণ খুলে যেতে পারে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি টিভিতে সম্প্রচার করা হয়েছিল। আমার বন্ধুবান্ধব বাবা-মা সবাই অবশ্যম্ভাবী একটা অঘটনের ভয়ে কাঠ হয়ে টিভির সামনে বসেছিলেন। পরে গুরুজী নিজে আমাকে ঘুঙুর বাঁধতে শিখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে খুব দামি একটা উপদেশ দিয়েছেন, নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করো। এই ঘটনা এক লহমায় আমাকে দায়িত্বশীল করে তুলেছিল এবং কোনও ব্যাপারে সমঝোতা না করার উচিত শিক্ষা দিয়েছিল। তারপর থেকে সব অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে একটা ব্যাগ থাকে। আমি ঘুঙুর নিজে বাঁধি। মেকআপও নিজেই করি।

এই দুটো ঘটনার কথা আমি আমৃত্যু মনে রাখব। সেই সঙ্গে স্মরণ করব আমার প্রেরণা, আমার পথপ্রদর্শক, আমার গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রকে। আমাকে আশীর্বাদ করুন গুরুজী যাতে আমি আপনার দেখানো পথে চিরকাল মাথা উঁচু করে চলতে পারি। আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আপনার মতো ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

(লেখিকা বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী)

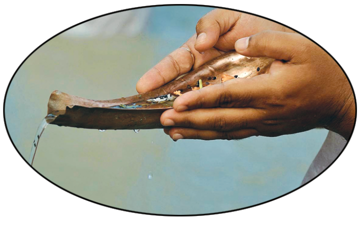

আমার লেখক জীবনের পথপ্রদর্শক রমাপদ চৌধুরী

রমানাথ রায়

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) একটা কথা প্রায়ই বলতেন। কথাটা আজও মনে আছে, ভুলিনি। তিনি বলতেন, পৃথিবীতে দু'ধরনের চাকা আছে। একটা হলো গাড়ির চাকা, আর একটা হলো কুমোরের চাকা। গাড়ির চাকা কেবলই ওপরে ওঠে আর নীচে নামে। আজ কেউ হয়তো ওপরে উঠল, কিন্তু তার ওপরে থাকাটা ক্ষণস্থায়ী। কাল সে আবার নীচে নেমে আসে। এছাড়া আর এক ধরনের চাকা আছে তা হলো কুমোরের চাকা। তার উত্থান নেই। পতনও নেই। সে কেবলই পাশে ঘোরে। রমাপদ চৌধুরী বলতেন তিনি কোনোদিন গাড়ির চাকা হতে চাননি। কারণ তিনি মনে করতেন, চাকরিতে উত্থান হলে, পতনও অনিবার্য। তিনি চোখের সামনে অনেকের উত্থান যেমন দেখেছেন, তেমনি তাদের পতনও দেখেছেন। আর পতন হলে তাদের কী করুণ অবস্থা হয় তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই চাকরিতে তাঁর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি চিরকাল আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক হিসেবে থেকে গেছেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন কুমোরের চাকা। তাই সেরকমই থেকে গিয়েছিলেন আজীবন। চাকরি-জীবনে তাঁর উত্থানও নেই, পতনও নেই। শুধু চাকরি জীবনে নয়, লেখক জীবনেও তিনি কোনও প্রতিযোগিতায় ছিলেন না। তিনি সারাজীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। শেষ জীবনে তিনি 'বনপলাশীর পদাবলী'র জন্যে এক কোম্পানির কাছ থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এত টাকার পুরস্কার আমাদের দেশে কেউ কোনোদিন পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ এর জন্যে তাঁর কোনও অহঙ্কার ছিল না। তবে একটু অভিমান ছিল। তিনি চেয়েছিলেন খবরটা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হোক। কেন যে হয়নি তা আমরা জানি না। শুধু তাই নয়, 'বনপলাশীর পদাবলী' তাঁর রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বতন্ত্র বই হয়ে প্রকাশিত হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন উপন্যাসটি স্বতন্ত্র বই হয়ে প্রকাশিত হোক। সেটা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ওপর তাঁর খুবই অভিমান হয়েছিল। অভিমান তাঁর নানা বিষয়ে ছিল। তবে সেসব অভিমান তিনি গোপন করে রেখেছিলেন। আমাদের দু'চারজনকে সেসব অভিমানের কথা বলতেন। তিনি এসব ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত চাপা স্বভাবের। তিনি অপরিচিত লোকের সামনে বড় একটা মুখ খুলতেন না। তাঁর

ব্যবহার অনেক সময় শীতল ছিল। ফলে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝত। মনে করত তিনি অহঙ্কারী, দুর্মুখ, রূঢ়ভাষী। অথচ এর মতো মিথ্যে কথা আর হয় না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি ছিলেন রুচিশীল এবং পরিশীলিত মনের অধিকারী। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর রীতিমতো পড়াশুনো ছিল। সেই সঙ্গে তাঁর ছিল অসম্ভব স্মৃতিশক্তি এবং বিচার করার দুর্লভ ক্ষমতা। এ গুণ আজ আর কারও মধ্যে তেমন দেখা যায় না। নব্বই বছর বয়সেও তাঁর এই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় ফোনে আমার সঙ্গে যখন তাঁর কথাবার্তা হতো, তখনও তার পরিচয় পেতাম।

কেন জানি না আমার প্রতি রমাপদ চৌধুরী ছিলেন স্নেহশীল। রবিবাসরীয়তে লেখা শুরুর সময় তিনি আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মনে রাখবেন রবিবাসরীয়তে লেখা আর লিটল ম্যাগাজিনে লেখা এক নয়। রবিবাসরীয়র লক্ষ লক্ষ পাঠক। লেখার সময় এই পাঠকদের কথা মাথায় রাখবেন। এখানে খারাপ গল্প লিখলে চারদিকে ছিছি পড়ে যাবে। লেখক হিসেবে আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। আর গল্প ভালো হলে সবাই ধন্য ধন্য করবে। এটা অনেকটা রবীন্দ্রসদনে গাওয়ার মতো। পাড়ার জলসায় খারাপ গান গাইছে, পরে তা শুধরে নেওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রসদনে খারাপ গান গেয়ে শুধরে নেওয়ার উপায় নেই। সবাই আপনাকে বর্জন করবে। কথাটা কখনও ভুলে যাবেন না।'

আনন্দবাজার আপনাকে যেমন রাতারাতি খ্যাতি দিতে পারে, তেমনি রাতারাতি অখ্যাতি দিতে পারে। তাই বলে আমি আমার স্বাতন্ত্র্যকে বর্জন করিনি। কথাসরিৎসাগরের শুরুতে পার্বতী মহাদেবকে বলেছিলেন, আপনি আমাকে এমন গল্প বলুন যা একই সঙ্গে নতুন এবং মনোহারী হবে। আমার কাছে এটাই ছিল লেখক হয়ে ওঠার মূল মন্ত্র। এই পথ থেকে আমি আজও বিচ্যুত হইনি।

রমাপদ চৌধুরী কত বড় লেখক ছিলেন তা বিচার করার সময় এটা নয়। ছাত্রজীবনে আমি তাঁর 'প্রথম প্রহর' পড়ে আকৃষ্ট হই। তারপর তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস পড়েছি, ছোটো গল্প পড়েছি। অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তাঁর ছোটো গল্প ছিল অনেক আধুনিক, অনেক স্মার্ট। লেখক সেটা বোধহয় জানতেনও। তাই উপন্যাসের চেয়ে ছোটো গল্পের প্রতি তাঁর বেশি দুর্বলতা ছিল। থাকবারই কথা। তিনি মনে করতেন উপন্যাসের চেয়ে ছোটো গল্প শিল্পমাধ্যম হিসেবে অনেক বড়, অনেক উন্নত, অনেক আধুনিক। ইচ্ছে করলে যে-কোনও লেখক একটা পেটমোটা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারে। কিন্তু 'ভারতবর্ষ'-এর মতো ছোটো গল্প শুধু একজনই লিখতে পারেন। তিনি হলেন রমাপদ চৌধুরী।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ)

পিতাকে রোজই তর্পণ করি

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

মহালয়ার দিনে আমরা সবাই পিতৃতর্পণ করে থাকি। কেউ গঙ্গায় গিয়ে, কেউ বা বাড়িতে পুরোহিত ডেকে। কিন্তু আমি কোনোদিন এরকম করিনি। কারণ আমার কখনও মনে হয়নি যে, আমার পিতা সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে বছরে একবার তর্পণ করলে বা শ্রদ্ধা জানালে ঠিক হবে। কারণ তিনি শুধু যে অত্যন্ত প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল সংগীতশিল্পী ছিলেন তা তো নয়, আধ্যাত্মিক দিকেও তিনি অনেক উচ্চস্তরে ছিলেন। না হলে ভারতবর্ষ জুড়ে যখন তাঁর খ্যাতি, মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির তিনি মিউজিক ডাইরেক্টর এবং ট্রেনার, ফিল্মি কর্পোরেশনে তিনি মিউজিক ডাইরেক্টর, ছ'টা বাংলা এবং ছ'টা হিন্দি সিনেমায় সুর করা হয়ে গেছে। বেগম আখতার, কাননদেবী, ছায়াদেবী, যুথিকা রায়, এস ডি বর্মন, রাজকুমার শ্যামানন্দ সিংহের মতো সব শিষ্য-শিষ্যা। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি সমস্ত যখন তাঁর হাতের মুঠোয়, সেই সময় মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে, সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে প্রায় কপর্দকশূন্যভাবে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চলে যান। সেখানে আশ্রমের ডাইনিং হলে ওয়াশিং সেক্‌শনে কাজ করতেন। অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমবাসী এবং যত দর্শনার্থী তাদের ব্যবহৃত থালা ধোয়ামোছা করতেন। ভাবা যায়! ভেতরে কতটা ত্যাগ থাকলে এটা করতে পারা যায়। বস্তুজীবনে কতটা অনাসক্ত থাকলে এমনটা করতে পারা যায়। অনেকের সম্পর্কে শুনি যে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন আমার জানতে ইচ্ছে করে, তিনি ঠিক কী ত্যাগ করেছিলেন! বেশিরভাগ খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে সংসারের দায়দায়িত্ব, পিতা-মাতার ভার ত্যাগ করেছিলেন। ভীষ্মদেব কিন্তু সেটা করেননি। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের দায়িত্ব তাঁরই মাথায় ছিল। সংসারের ব্যবস্থা করে তবেই গিয়েছিলেন। এমন একজন পিতার বছরে একবার তর্পণ করলে হয়? আমি রোজই তাঁকে প্রণাম জানিয়ে থাকি। শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকি। একবার একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমার সঙ্গে আমার পিতা ভীষ্মদেবের পার্থক্য কোথায়? আমি বলেছিলাম, এ তো খুবই সহজ। ভীষ্মদেব রিসার্চের বিষয়, আর আমি রিসার্চ করি। তিনি পরমপূজ্য আর আমি তাঁর পূজা করি। তিনি অনুসরণীয়, আর আমি তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করি।

প্রকৃত শিল্পী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন তিনি। সবসময় সত্য কথা বলা, দৃঢ়চেতা এক পুরুষ। সম্পূর্ণভাবে সংগীতে নিবেদিত প্রাণ। সাধক বা সাধু খুঁজতে তাই আমায় বাড়ির বাইরে

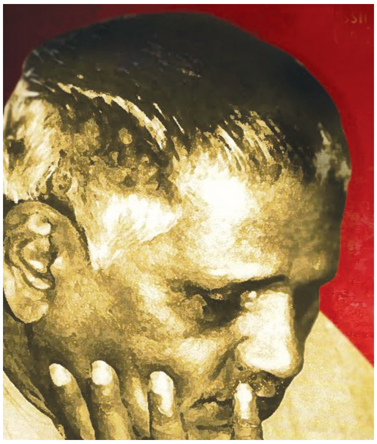

কোথাও যেতে হয়নি। বাড়িতেই পেয়েছি। এটা ঠিক যে সাধারণভাবে সকলে বাবা বলতে যা বোঝেন, তেমন বাবা তিনি আমার ছিলেন না। কিন্তু নিজের জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে, ছোটো ছোটো কথা বলে তিনি এমন কিছু শিখিয়ে গেছেন যা আমার কাছে অনেক বড়ো সম্পদ। এই ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় শুধু যে আমার কাছেই এমন শ্রদ্ধেয় তা কিন্তু নয়। ভীষ্মদেব যখন সব ত্যাগ করে আশ্রমে চলে যান, তখন সংগীত জগতে তাঁর স্থান কোথায় ছিল তা প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ধীরেন মিত্র আমাকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তার থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। ''ভীষ্মবাবু প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা বলি যে, তিনি যখন এখান থেকে পণ্ডিচেরী চলে গেলেন গানবাজনা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, তখন ওঁর কলকাতায় সংগীতক্ষেত্র যাকে চলতি কথায় আমরা মার্কেট বলি সেটাকে এককথায় বলা যায় Enviable। যে কোনও শিল্পীই বলবেন— বাহ্‌ এরকম মার্কেট যদি আমরা পেতাম। এই রকম মার্কেট ছেড়ে দিয়ে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। এখনকার যুবসমাজ যেমন হেমন্ত মুখার্জির নামটা শুনলে যেরকম উল্লসিত হয়, মানে হেমন্তবাবু আধুনিক গানের জগতে একটা Zenith, একটা সূর্য হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ভীষ্মদেববাবুও সে সময় ক্ল্যাসিক্যাল গানের জগতে ওইরকম জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, ওই পজিশনকে নস্যাৎ করে তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান।''

পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ী একবার রেডিয়োতে বলেছিলেন যে, ভীষ্মদেব সাধনার এমন উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে সাধারণের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি একবার এইচ এম ভি-তে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে— মানবদা, আপনারা তো এতো সব হ্যান্ডস্‌ নিয়ে বাংলা গান করেন। কিন্তু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র একটা হারমোনিয়াম নিয়ে যে বাংলা গান গেয়ে গেছেন...মানবদা আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন যে, দেখ ভাই, আমরা অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ছ'হাজার বাংলা গান গেয়েও ওই ছ'খানা বাংলাগানের কাছে কোনোদিন পৌঁছতে পারিনি, আর পারবও না। সত্যিই তিনি সাধক শিল্পী ছিলেন। শিল্পী তো অনেকেই হন। তাঁর গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতে হয়েছে।'

আমি দু'বার ছায়াদেবীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সাক্ষাৎকারের শেষের দিকে তিনি জানান— ''ভীষ্মদেবের সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল অনুভব করার। এটা বলবার বা আলোচনার বিষয় নয়। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ আর নেই। আমি কতটুকুই বা বুঝতে পেরিছি। বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন সৌন্দর্য দেখে এসেছি, একটা মন্দির দেখে এসেছি। সাধারণের সঙ্গে তাঁর কোনও মিলই ছিল না। সর্বক্ষণ সুরে ডুবে থাকা এক লোক। তিনি সুরের মধ্য দিয়ে নিজের রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি সংসারের বাইরের মানুষ। অন্য জগতের লোক।''

(লেখক সংগীতসাধক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র)

কলকাতায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে অটলহিরী স্মরণসভা

‘অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বচ্ছ এবং নৈতিকতাপূর্ণ রাজনীতির ধ্রুবতারা ছিলেন। মার্জিত শব্দ প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার এক একটি পংক্তি তাঁর হৃদয়ের শুদ্ধ ভাবনাকে প্রকাশিত করে। তৃণমূল স্তরের কার্যকর্তার প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল।’ গত ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়-সহ প্রায় ৬০ টি সংস্থার দ্বারা আয়োজিত এক স্মরণসভায় কথাগুলি বলেন সভার সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বল্লভভাই শর্মা। এছাড়া বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুতপূর্ব উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী সজ্জন কুমার বনসল।

সভার শুরুতে ১৯৯৪ সালে কুমারসভা পুস্তকালয় দ্বারা আয়োজিত স্বর্গীয় অটলজীর কবিতা পাঠের দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদর্শিত হয়। ৬০ টি সংস্থার পক্ষ থেকে স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সভা সঞ্চালন করেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

কলকাতায় ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী সংবর্ধনা সমারোহ

কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ তথা হিন্দি সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠীকে সম্প্রতি মরিশাসে অনুষ্ঠিত ১১ তম বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে ‘বিশ্ব হিন্দি সম্মান’-এ ভূষিত করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে গত ৫ সেপ্টেম্বরে স্থানীয় অসোয়াল ভবনে এক সংবর্ধনা সমারোহের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পদ্মশ্রী ড. কৃষ্ণবিহারী মিশ্র। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমীক্ষক কবি ড. ওম নিশ্চল। ড. ত্রিপাঠীকে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পুষ্পহার ও শাল দিয়ে অভিনন্দিত করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস।

তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির রক্তদান শিবির

গত ৯ সেপ্টেম্বর তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির পরিসরে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে মোট ৪৩ জন রক্ত দান করেন। সমাজসেবী রুধিররঞ্জন নায়ক, তাপস ভট্টাচার্য, জয়রাম মণ্ডল, লক্ষ্মীকান্ত মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, অপূর্ব ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ করণ প্রমুখ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

বিবেকানন্দ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে সকলকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি খোদিত একটি স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

উত্তরবঙ্গ কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উত্তরবঙ্গ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২০-২১ সেপ্টেম্বর একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মালদা জেলাহর গাজোলের বি এস এ ক্রীড়াঙ্গনে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সূচনা করেন কল্যাণ আশ্রমের উত্তরবঙ্গের সহ সভাপতি লক্ষ্মীরাম টুডু। সাব জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা বিভাগে হয়। ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০, ১৫০০ এবং ৩০০০ মিটার দৌড়, লৌহগোলক নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফন ও তিরন্দাজিতে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরপদ বিশ্বাস, দেবাশিস ভৌমিক, শ্রীমতী ঊষারানি মিশ্র, পঞ্চানন টুডু ও রামরঞ্জন বাস্কে।

শ্রদ্ধা'র ১০৬ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

গত ২ সেপ্টেম্বর সিউড়ি নগরের প্রবীণ নাগরিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সিউড়ি নগর সঙ্ঘচালক ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীদামসুন্দর দাসকে শ্রদ্ধার ১০৬ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় তাঁরই ভদ্রাসনে।

তিনবার ওম্ ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জীবন মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অলকা গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীদাসের হাত-পা ধুইয়ে পূজা করেন তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে তাঁকে মাল্যদানে ভূষিত করে শ্রীগীতা, বস্ত্র, উত্তরীয় ও মানপত্র নিবেদন করা হয়। তাঁর আরতি করেন শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তী ও শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত লোকগীতিকার ও লোকগায়ক রতন কাহার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র।

মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ই-পত্রিকা প্রকাশ

গত ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার মাহেশ্বরী সভার মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ই-পত্রিকা 'সক্ষম'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয় শিক্ষণ কেন্দ্রের সভাপতি ডি কে মেহতার হাতে। তিনি বলেন, বর্তমানে ডিজিটাল যুগে ই-পত্রিকার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছনোর এটি সরল মাধ্যম। উপস্থিত

ছিলেন কেন্দ্রের সম্পাদক অর্পণ কুমার সোনী। 'সক্ষম'-এর সম্পাদক পঞ্চানন ভট্টড় বলেন, এই পত্রিকা শিক্ষণ কেন্দ্রের মুখপত্র। উপস্থিত ছিলেন সুশ্রী পদ্মা বাগড়ী, বৃজমোহন মিমানী, নারায়ণদাস ডাগা, আদিত্য বিনানী প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের উপ সভাপতি সীতারাম ডাগা।

তর্পণ মূলত শিকড়ের সন্ধান

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে কে তুমি?'

ভারতাত্মারও সেই একই জিজ্ঞাসা— 'কোহহং'— কে আমি? চিরন্তন এই প্রশ্নই অহরহ উচ্চারিত ভারতীয়-জীবন দর্শনে। এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই ভারতীয়রা খোঁজে তাঁদের শিকড়কে। সেই শিকড়ের প্রতি এক হৃদয়ছেঁড়া আকুতিতেই তর্পণের জলাঞ্জলি।

তর্পণ উৎসের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এক মাধ্যম। তর্পণ বিশ্ববোধ গড়ে তোলার, এই চরাচরের সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং একই সঙ্গে সকলের কাছে ঋণ স্বীকারের এক শাস্ত্রীয় বিধান।

তর্পণ শব্দটির সাধারণ অর্থ তুষ্টিসাধন। জল দানের মধ্য দিয়ে পিতৃলোককে তৃপ্ত করার এক অনুষ্ঠান তর্পণ। তর্পণের মধ্য দিয়েই উদ্ভাসিত হয় এক অপূর্ব জীবনদর্শন। দেহের বিনাশ হয়। কিন্তু সেই দেহস্থিত আত্মা অবিনশ্বর। স্বভাবতই পিতৃপিতামহ ক্রমে পূর্বপুরুষদের দেহে অবস্থান ছিল যে আত্মার, সেই আত্মা এখন এই পার্থিব জগতের যে শরীরেই অবস্থান করুন না কেন, উত্তরপুরুষের স্মরণ ও আহ্বানে তৃপ্ত হন সেই অক্ষয় আত্মাই। বিশ্বাস, তর্পণের জল এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় দ্রব্যের পরমাণু মন্ত্রবলে সেই প্রস্থিত আত্মার বর্তমান শরীরের খাদ্যবস্তুর পরমাণুর সঙ্গে মিশে পরিতৃপ্ত করে তাঁকে। এমনই এক ধর্মীয় বোধে হিন্দুর এক অনুষ্ঠান এটি। গরুড় পুরাণের উক্তি— তর্পণং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবাদিপিতৃতুষ্টিদম্—তর্পণ করলে দেবতা এবং পিতৃগণের পরিতুষ্টি হয়। একইভাবে মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, ব্রহ্মপুরাণ ইত্যাদিতেও তর্পণ বিধির কথা বলা হয়েছে। হিন্দুর

পরম্পরা

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই তর্পণ। প্রকৃতপক্ষে এটি শুধুই একটি বিশেষ দিনের করণীয় অথবা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অঙ্গ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৃহস্থ জীবন যাপনেরও এক অর্থবহ সংস্কার।

চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস— ভারতীয় সনাতন ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চারটি আশ্রমের জন্য বেশ কিছু অবশ্য করণীয়েরও বিধান রয়েছে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে। সেই বিধান অনুযায়ী গার্হস্থ্য আশ্রমের করণীয় হলো পঞ্চমহাযজ্ঞ। গৃহস্থের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় গৃহস্থালীর নানা কাজে ও ব্যবহারে কীটপতঙ্গ প্রভৃতির প্রাণনাশ হয় কিছুটা অজান্তেই। উনুন, শিলনোড়া, ঝাঁটা, মুষল, জলপাত্র প্রভৃতির ব্যবহারের সময় ঘটে প্রাণীহত্যা। আর তার জন্য পাপের ভাগী হতে হয় গৃহস্থকে। সেই পাপমুক্তির জন্য পাঁচটি মহাযজ্ঞ করার নির্দেশ আছে মনুসংহিতায় (৩/৬৮-৬৯)। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ— এই পাঁচটি যজ্ঞ প্রথম করার বিধান দিয়েছেন মনু। এর মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হলো ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃ তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ। হোম হলো দৈবযজ্ঞ, পশুপাখিদের খাবার দেওয়া ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা হলো নৃযজ্ঞ। মনুর উক্তি, 'পিতৃযজ্ঞ তর্পণম্'। স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু-জীবনে তর্পণের মহিমা অসীম। তর্পণ শুধু পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত করা নয়, তর্পণ হলো শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার, বিরামহীন অভিযাত্রা স্মরণের এক দৈনন্দিন আনন্দও। শুধু গৃহস্থ নয়, ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য হিসেবে তর্পণকে চিহ্নিত করা হয়েছে মনু সংহিতায় (২।১৭৬)। বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন প্রভাতে শৌচ, স্নান-আহ্নিক ইত্যাদির পর অবশ্যই ঋষি ও পিতৃতর্পণ করতে হবে।

প্রত্যহের কৃত্য হলেও বেশির ভাগ মানুষই আর এখন নিত্যতর্পণ করেন না বা করতে পারেন না। কিন্তু পিতৃপক্ষের শেষ দিন মহালয়া বা সর্বপ্রীতি অমাবস্যায়

পিতৃপুরুষকে স্মরণ ও তিলাঞ্জলি তর্পণের কর্তব্যবোধ থেকে এখনও বিচ্যুত হননি দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ। মহালয়ার এই মহাতর্পণের কথা বলার আগে বরং স্মরণ করা যাক তর্পণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা।

মনু সংহিতার বিধানে তর্পণ প্রত্যহের কর্ম। এই তর্পণ এবং তার অঙ্গ অবশ্য একরকম নয়। সন্ধ্যাহ্নিকের সঙ্গে প্রতিদিনের পিতৃযজ্ঞ- রূপ তর্পণের নাম প্রধান তর্পণ। আর স্নানাদি কাজের সঙ্গে যে তর্পণের বিধি, তার নাম অঙ্গ তর্পণ। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যভেদে অন্যান্য কর্মের মতো স্নানও তিন রকম। স্বভাবতই স্নানাঙ্গ তর্পণও তিনরকম।

সাধারণ বিধি হিসেবে পিতৃপক্ষ ছাড়া অমাবস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন পর্বদিনে, তীর্থদর্শনে, গ্রহণ ইত্যাদি যোগে তর্পণ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে নিত্যতর্পণ করার বিধি। প্রেততর্পণে তিল ব্যবহার করতে হয়। পর্ব এবং পিতৃপক্ষের তর্পণও তিল সহযোগেই। তবে নিত্যতর্পণ শুধুই জল দিয়েও করা যায়। সেদিক থেকে তর্পণ হলো দু' রকম, উদক বা জল তর্পণ এবং সতিল জল তর্পণ।

প্রাচীন বিধিতে বিভিন্ন পর্বদিনে ও যোগে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ— দুই-ই করার বিধি ছিল। কালে তা শুধুই তর্পণে পরিবর্তিত হয়েছে। এবং সে বিধিও পালন করা হয় অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রেই। তবে এখনও বহু মানুষই প্রতিদিনের সন্ধ্যা-আহ্নিকের সঙ্গে পিতৃতর্পণ করে থাকেন। সাধারণভাবে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ মাতামহ এবং মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী ও মাতামহী, প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধ মতামহীকে শুধুই জল দিয়ে স্মরণ করা হয়। তৃপ্ত করা হয় উদক-তর্পণে।

তর্পণের ক্রমগুলি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, তর্পণের মধ্য দিয়ে সনাতম হিন্দুধর্মের এক বিশ্বজনীন ভাবনার রূপ। বসুধৈব কুটুম্বকম্‌ যে শুধুই একটি বাক্যবন্ধ নয়, সেটি যে হিন্দুর আন্তরিক বাসনারও রূপ তারই এক উজ্জ্বল চিত্র তর্পণ। রাষ্ট্রীয় দর্শনে যে সাম্য, যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সদ্ভাবনার কথা বলা হয়, হিন্দুর তর্পণে রয়েছে তার সার্থক রূপায়ণ। শুধু নিজের জন্য বা নিজের প্রয়াত পূর্বপুরুষদের জন্যও নয়, এই চরাচরের সমস্ত মানুষ, এমনকী কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীর তৃপ্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয় তর্পণের মধ্য দিয়ে। এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই, নেই আপন-পর বিচার— সকলে সুখে থাকুক এই কামনাই ধ্বনিত হয় তর্পণ মন্ত্রে। তর্পণকারীর আন্তরিক প্রার্থনা— আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।

একটি ধর্মীয় কৃত্য সম্পাদনের সময় এইভাবে বিশ্বচরাচরের সকলের মঙ্গল কামনার নজির অন্য কোনো ধর্মের আধারে খুঁজে পাওয়া ভার, এমন কথা বলা যেতেই পারে।

তর্পণের যে ক্রম— তার থেকেই বোঝা যায় সনাতন ঋষিদের আকাশস্পর্শী উদারতার কথা। দেবতা, ঋষি স্মরণের পর পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় তিলাঞ্জলি। এরপর ভীষ্মতর্পণ, রামতর্পণ, লক্ষ্মণতর্পণ-এর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করা হয় বন্ধু, অবন্ধু এমনকী জন্মান্তরের বন্ধুদের। আগুনে মৃত্যু হয়েছে যাদের তাদের সকলের তৃপ্তির জন্য জলদান করা হয় তর্পণের মাধ্যমে। মূল কথা, শুধু নিজের পিতৃ-মাতৃকুলের বা আপনজনদের নয়, এই বিশ্বের প্রতিটি জীবের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, মমত্ব এবং সমত্ব অনুভবের এক সর্বাত্মক অনুষ্ঠান এই তর্পণ।

পিতৃপক্ষের তর্পণের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়, ওই পক্ষকলা সময়ে পিতৃপুরুষরা আসেন এই মরজগতে তাঁদের উত্তরপুরুষদের কাছে। আর তখনই উত্তরপুরুষের নিবেদিত এলাকাগুলিতে তৃপ্ত হন তাঁরা। এই সময়ের পার্বণ শ্রাদ্ধও হয় পিতৃপুরুষের তৃপ্তির কারণ।

মহাভারতের কাহিনি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত কর্ণ স্বর্গবাসী হলে তাঁকে নানারকম ধনরত্ন দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। কিন্তু দেওয়া হয় না তৃষ্ণার জল অথবা ক্ষুধার অন্ন। ইন্দ্রের কাছে এইরকম বিপরীত ব্যবহারের কারণ জানতে চান কর্ণ। ইন্দ্র বলেন, কর্ণ মরজগতে অসংখ্য দান করেছেন। দাতা কর্ণ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু আজীবন তিনি সকলকে দিয়ে গেছেন শুধু ধনরত্ন সম্পদ। কাউকে দেননি এক বিন্দু জল অথবা অন্ন। তাই স্বর্গবাসী হলেও তিনি বঞ্চিত হবেন অন্ন-জল থেকে।

কর্ণ বলেন, এই অপরাধ করেছেন তিনি নিজের অজ্ঞাতেই। তাই এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। তখন তাঁকে এই পিতৃপক্ষের পনেরোদিন মর্ত্যে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। কর্ণ মর্ত্যে এসে পনেরোদিন ধরে জল ও অন্নদান করার পুণ্যেই স্বর্গে গিয়ে পান পানীয় ও খাদ্য।

মোট কথা, পিতৃপক্ষের এই পনেরোটি দিন হিন্দুর জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এটি হলো পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণ স্বীকারের অনুষ্ঠান। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর এক পুণ্য অনুষ্ঠান।

পাশ্চাত্যেও অবশ্য রয়েছে পূর্বজনের স্মরণের এক রীতি। সেখানেও বছরের একটি নির্দিষ্ট দিন পালিত হয় থ্যাঙ্কস গিভিং ডে হিসেবে।

ড্রেক্সল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ ঊষা মেননও এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য স্বীকার করে বলেছেন, পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম এবং তাদের অজাতক উত্তরপুরুষরা রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। বর্তমান প্রজন্ম শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মাধ্যমে পরিশোধ করেন পিতৃপুরুষের প্রতি তাঁদের ঋণ। পিতা-মাতা ও গুরুর কাছে ব্যক্তির ঋণের মতোই পূর্বপুরুষদের কাছে এই ঋণও অপরিশোধ্য। স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে স্মরণ করা হয় শুধু সেই ঋণের কথা। তর্পণ ও শ্রাদ্ধ সেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তেরই এক রমণীয় বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এসব কারণেই তর্পণ শুধু একটি ধর্মীয় বিধি নয়। এটি মিলনের ও পূর্বজনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ■

শক্তি রূপেণ সংস্থিতা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

শ্রীশ্রী চণ্ডীর এই মহামন্ত্রটি আমাকে ছোটোবেলা থেকে ভীষণ ভাবে টানে। সেই ছোটোবেলা থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পাঠ শুনে আসছি আকাশবাণীতে মহালয়ার শুভ মুহূর্তে। সেই থেকেই একটা ছাপ মনের মণিকোঠায় গেঁথে আছে।

আদ্যাশক্তি, পরমা প্রকৃতি বিশ্ব প্রসবিণী জগন্মাতা দুঃখতাপ হারিণী, মোক্ষফলদাত্রী দেবী কৃষ্ণকৃপা বিলাসিনী।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে পাই— ত্বং বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসিমায়া প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য। ঈশ্বরের দুটি রূপ— পুরুষ ও প্রকৃতি। বেদে ঈশ্বর বলেছেন— একোহহং বহুস্যাম্ অর্থাৎ আমি এক, বহুও হয়ে থাকি। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ্বররূপ গ্রহণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। ভক্তেরা নিজেদের রুচি অনুসারে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করলেন।

দেবী ভাগবত মতে, সর্বভূতে শক্তি আত্মারূপে বিদ্যমান। সেই অনুসারে পরম পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ সচ্চিদানন্দ এবং দ্বিতীয় ভাগ পরাশক্তি, মায়া প্রকৃতি। কিন্তু ওই দুই ভাগ মূলত এক ও অভিন্ন। সেই সচ্চিদানন্দ রূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্ত সন্তানকে কৃপা করার জন্য রূপ ধারণ করেন।

ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শক্তিপূজা প্রচলিত। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বছর আগে পঞ্জাবের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নগরে দেবী পূজার প্রচলন ছিল। সেই প্রাচীন নগরের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে তাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসীদের উপাস্য দেবী। বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদের দেবী সূক্ত ও রাত্রীসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রীসূক্ত হতেই স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বর্ধিত হয়েছিল। দেবীসূক্তের ঋষি মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মা রূপে অনুভব করে বলেছিলেন— আমিই ব্রহ্মময়ী আত্মাদেবী ও বিশ্বেশ্বরী। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র ঋগ্‌বেদে প্রদত্ত আছে। এই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি আছে। যথা— বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গা প্রভৃতি। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে, মহাশক্তি মূলা প্রকৃতি হতে বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরাসত্তা। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেবীকে সর্বশক্তিমতী বিশ্ব প্রসবিনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই দেবীশক্তিকে কেউ শক্তি, উমা, লক্ষ্মী, ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী নামেও অভিহিত করেছেন। এছাড়া শক্তির আরও দশটি রূপ দশ মহাবিদ্যায় পাই। যথা— কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

দুর্গা, চণ্ডী, কালী যে নামেই ডাকি না কেন প্রত্যেক দেবীই শক্তির আধার ও উৎস।

পূজা কথাটা সাধারণত মূর্তি পূজাকেই বুঝায়। মূর্তি পূজা শুধুমাত্র পৌত্তলিকতা নয়। মূর্তিপূজা অনন্ত অসীম ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা। নিরাকার ঈশ্বরের সাকার উপাসনা। মূর্তি এখানে শুধু মিডিয়ামের কার্য সমাধা করে। অনেকটা বেতার যন্ত্র বা রেডিয়ো যন্ত্রের মতো। রেডিওতে গান বাজছে, সেই গান কোনও রেডিয়ো স্টেশন যথা আকাশবাণী থেকে সম্প্রচার হচ্ছে। শিল্পী রেডিয়ো সেন্টারে বসে গান গাইছেন সেটা আকাশবাণী মারফত সম্প্রচারিত হচ্ছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ইথারতরঙ্গে শব্দ ভেসে বেড়ায়। শব্দের মৃত্যু নেই। তাই শব্দকে ব্রহ্মের নাদ বলে কথিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ ইথার তরঙ্গে শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। শিল্পীর গানকে অর্থাৎ শব্দকে তরঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট কিলোহার্টজ বা কিলো সাইকেলে। রেডিয়োর মধ্যে থাকে রেডিয়ো অ্যাকটিভ্। সেই রেডিয়ো অ্যাকটিভ দিয়ে রেডিয়ো যন্ত্র তা ধরে এবং স্পিকারের মাধ্যমে আমরা গান শুনতে পাই। তাই রেডিয়ো যন্ত্রটি শুধুমাত্র একটা মাধ্যমের কাজ করছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে অনন্ত শক্তি, মূর্তিরূপ রেডিয়ো তৈরি করে ভক্তের ভক্তিরূপ রেডিও অ্যাকটিভ দিয়ে ধরে মূর্তিতে স্থাপন করে ভক্তেরা সেই অসীম অনন্তশক্তিরই পূজা করে থাকেন। দেখতে মূর্তিপূজা বা পুতুল পূজা মনে হলেও তা কিন্তু পৌত্তলিকতা নয়। ভিতরের দর্শন পর্যবেক্ষণ করলে তা অনায়াসেই বোঝা যাবে। মূর্তিপূজা অনন্ত অসীম ঈশ্বরের সাকার প্রতীক উপাসনা। অনেকেই দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজাকে শুধু হিন্দু সমাজের পূজা বলে একটু লঘু করতে চান, কিন্তু এই পূজার লক্ষ্য সমগ্র জাতির ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধন। বলতে বাধা নেই দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব আজ সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাইরে আপামর ভারতবাসীর তথা

বিশ্ববাসীর নিকট শারদোৎসবে পরিগণিত হয়েছে। আজ বিশ্বের সর্বত্রই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুর্গা প্রতিমার লক্ষ্মী ধনের প্রতীক, সরস্বতী জ্ঞানের, কার্তিক বীরত্বের, গণেশ সাফল্যের দ্যোতক। ওই সকল গুণ শক্তির অধিকারী হলেই জাতি সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করে।

আর দেবী দুর্গার দশটি হাতে দশটি প্রহরণ অপরিমেয় বল ও বীর্যের প্রতীক। বর্তমান বিশ্বে দুর্বলের স্থান কোথায়? চাই শক্তির আরাধনা। এই জন্যই শক্তি পূজা। দুর্গা দশভুজা অনন্ত শক্তিরই প্রতীক। তাই শক্তিপূজা অর্থাৎ দুর্গা, কালী, ভুবনেশ্বরী অনন্ত শক্তির প্রতীক পূজা। মাতৃভাবে অনন্তের উপাসনা।

শব্দই ব্রহ্ম স্বরূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শব্দ দ্বারাই সৃষ্টি। বেদের বাণী, বাইবেলের বাণী, পুরোহিতের মন্ত্রধ্বনি যা প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে মুখ দিয়ে, যা চলেছে নিত্য অনন্তকালের পানে ধেয়ে তা শুধুই শব্দ মাত্র। দুই ঠোঁট থেকে শব্দ বিন্দুর আকারে বের হয়। ফলে শব্দ থেকে যে দেবতা বের হয় তা সাধকের সন্তান তুল্য। এই দেবতারা সাধকের কল্যাণের জন্যই আবির্ভূত হন। দেবতা হলেন সাধকেরই চৈতন্য মাত্র। সাধক নিজেই তাঁকে জাগরিত করে ফল লাভ করেন। মন্ত্র হলো চৈতন্যেরই রূপ— বিজ্ঞানরূপ। মন্ত্র হলো জীবের সংস্কার। মন্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব হলো মনঃসংযোগ করে চিন্তাকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীবন্ত করা। মন্ত্রবিদ্যাকে বলে চিন্তাবিজ্ঞান। ভাষা হিসাবে এর প্রকাশ ঘটে শব্দ ব্রহ্ম থেকে।

এরপর আসে বর্ণ। বর্ণ হলো ৫০টি, আদিবর্ণ নিয়ে ৫১টি। দিগম্বরী মায়ের গলায় ৫০টি নরমুণ্ড হয়ে এই বর্ণই শোভা পাচ্ছে। এগুলিই সংস্কৃত অক্ষরের বর্ণ। ধ্বংসের মধ্যে অর্থাৎ শ্মশানে শবরূপ শিবের বুকে মা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রলয়কালে সকল বর্ণকে তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেন। একেই বলে মহাপ্রলয়। শিব বিন্দুতে প্যাঁচানো মহাকুণ্ডলী হিসেবে তাঁর থেকেই বর্ণ সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। মহাকুণ্ডলী যখন এক প্যাঁচে থাকেন তখন তিনি বিন্দু। যখন দুই প্যাঁচে থাকেন তখন প্রকৃতি + পুরুষ। তিন প্যাঁচে তিনি নানাবিধ শক্তি ও গুণ। যথা— ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—সত্ত্ব, তমঃ এবং রজ। এখান থেকেই প্রকৃতি আদিবর্ণ দুটি-সহ ৪৯টি নানা নামে অবতরণ করেন। তিনি তখন সৃষ্টিমুখী।

এই ভাবে মহাকুণ্ডলী থেকে বিন্দু ও প্রকৃতি + পুরুষ অবস্থা নিয়ে মহাশক্তির একান্নটি প্যাঁচ। এই যে শক্তি, যিনি বিভিন্ন তরঙ্গে বা বর্ণমালায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিতা হয়ে নিজের বক্ষেই নিজেকে বর্ণমালারূপে শোভিত করেছেন, সেই এক একটি বর্ণের মধ্যে কী ধরনের দিব্যশক্তি লুক্কায়িত আছে 'কামধেনুতন্ত্র'-এ তা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা আছে।

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বর্ণই স্বয়ং পরমাকুণ্ডলী আদ্যাশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র। এই বর্ণ থেকেই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে। এই বর্ণগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তার ফোর্স ফিল্ড রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। নানা স্তরে, নানা ফ্রিকোয়েন্সিতে এদের অবস্থান। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আদ্যাশক্তি মাত্র। সেই আদ্যাশক্তিই কালী। একান্নটি বর্ণ তরঙ্গে এই মহাকালীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রতিফলিতা। এইজন্য দেবীবক্ষে একান্নটি মুণ্ডমালা অর্থাৎ বর্ণমালা ধারণ করে আছেন। মুণ্ডের মধ্যে যেমন জীবের সবকিছু সুপ্তভাবে থাকে, তেমনিই সৃষ্টির সূক্ষ্মবীজ এই বর্ণগুলির মধ্যেই রয়েছে। এই জন্যই কালিকাদেবী একান্নাক্ষরা মাতৃমূর্তি। এই একান্নটি অক্ষরের একান্নটি শক্তিতরঙ্গ। সেই একান্নটি শক্তিমূর্তির কথা হিন্দুরা একান্নটি শাক্ততীর্থে একান্নটি নামের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। একান্নটি বর্ণের চিন্তা থেকেই ভারতে একান্নটি শাক্ততীর্থের কল্পনা এসেছে। সতীর দেহত্যাগরূপ কাহিনি থেকেই এই শক্তিপীঠগুলির অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে। এই একান্নপীঠের কাহিনিকে অবমাননা না করে রূপক হিসেবে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ শিবের স্কন্ধ থেকে কালচক্রে অর্থাৎ বিষ্ণুচক্রে সতী বিচ্ছিন্ন হলে তাঁর ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহখণ্ড থেকে একান্নটি শক্তিপীঠ তৈরি হয়। আসলে রূপকটির প্রকৃত অর্থ হলো কাহিনিতে শিব হলেন পরমপুরুষ সৎ। তাঁর সুপ্ত শক্তিই সতী— যা বিস্ফোরণের বেগে দেশে একান্নটি তরঙ্গে বা বর্ণে কালপ্রবাহে ধাপে ধাপে ছড়িয়ে পড়েছিল। শক্তির এই একান্নটি ধাপই একান্নটি শক্তিপীঠ।

দিগম্বরী মায়ের দিকে একবার ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় মায়ের হাতে যে খড়্গটি আছে তার চোখ আছে অর্থাৎ খড়্গটি চক্ষুষ্মান। ওটা জ্ঞান বা বিবেক রূপ বা প্রতীক। মায়ের দন্ত সকল শ্বেত বর্ণ যা কিনা সত্ত্বগুণের প্রতীক। জিহ্বা লাল রং যুক্ত, যা তমগুণের প্রতীক, মা সর্বদা সৃষ্টি কর্মে ব্যাপৃত আছেন যা রজগুণের প্রতীক। মায়ের পদতলে শিব শব হয়ে আছেন। শিব মঙ্গলের প্রতীক। অর্থাৎ সত্ত্ব দিয়ে তমগুণকে চেপে ধরে জ্ঞানরূপ অসি দিয়ে দেহের কামাদি ষড় অসুরকে বলি দিতে পারলে শিব মঙ্গল থাকবে পদানত। অর্থাৎ মঙ্গল থাকবে নিজ আয়ত্তে।

পৃথিবীর সব দেশেই এক সময় মাতৃসাধনা বা শক্তিসাধনা প্রচলিত ছিল। এর উৎস বোধহয় এই যে সকল প্রাণের সৃষ্টিই মায়ের গর্ভ থেকে। সুতরাং মানুষের কাছে প্রাণের উৎস হিসেবে 'মা'-ই প্রথম দেখা দিয়েছেন। সেই ঋগ্‌বৈদিককাল থেকেই বৈদিকধর্মেও মাতৃদেবতা যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েই ছিলেন। পুরুষাত্মক অবস্থাকে যেমন ব্রহ্ম হিসেবে কল্পনা করা হয়, মহিলাত্মিক অবস্থাকেও তেমনিই ব্রহ্মময়ী হিসেবে কল্পনা করা হয়।

ভারতবর্ষে শক্তিকে প্রকৃতি অর্থাৎ নারী রূপে কল্পনা করা হয়। সেই শক্তির তরঙ্গ থেকেই বিশ্বজগতের প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তরে শক্তিতরঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে শক্তি সাধকরা শক্তির নানা রূপ কল্পনা করেছেন এবং যথার্থভাবে শক্তির নানারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে মাতৃশক্তি নানা নামে নানা রূপে বিভূষিতা হয়েছেন। *(লেখক ব্যবহারজীবী)*

জবাকুসুম

বারিদবরণ বিশ্বাস

হেমন্তের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে সবে। মাঠে মাঠে পাকা ধানের শীষ সোনার রঙে রাঙিয়ে উঠেছে। একপাশ কেটে চেছে দুটো চোখ বের করে খেজুর গাছের মাথায় খিল-নলি পুঁতে কলসী বেঁধেছে সিউলি। সকালের সোনারোদ যেন ঝকমক করছে প্রকৃতির আনাচে কানাচে। তবু হারু বাগদির মনে কোনও

আনন্দ নেই। কী যে অসুখ হয়েছে ওর! গায়ে নোংরা থান কাপড় জড়িয়ে তিন মাথার মোড়টায় ভ্যান নিয়ে ঠায় বসে থাকে। লুঙ্গির খুঁট থেকে সোনালি বিড়ির প্যাকেট বের করে ধুপ করে গ্যাস লাইটার জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দেয়, আর কাশে। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই দেখা হয়। আর দেখা হলেই বিড়িটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে অতি বিনম্রতার সঙ্গে বলে, মাস্টারমশাই চললেন; স্কুল ছুটি হলো— এরকমটি টুকরো অথচ সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা। আমি উত্তর দিতাম হ্যাঁ। চললাম। তোমার শরীর ভালো আছে তো। দু' একদিন হাতে সময় থাকলে কথা বলতাম একটু বেশি। হারুও আমাকে বলত মাস্টারমশাই দেখবেন একটু আমার জবাকে। এরপর বছর এক দুই পর পর বলে, কুসুম, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ টুকটুকি আসে আর বলে, মাস্টারমশাই দেখবেন একটু। বাড়িতে একদম পড়ে না। ধরে বেঁধে পড়াতে হয়। হারু পিতা হিসাবে তার কর্তব্য করে আর আমিও শিক্ষক হিসাবে যতটা পারি চেষ্টা করি। হ্যারে, বাবা কিন্তু নালিশ করেছে। জবার মাও আমাকে ওদের মাস্টারমশাই হিসাবে যথেষ্টই সমীহ করে। ওরা পড়াশোনা কেমন করছে? আমরা তো মুক্কুসুক্কু মানুষ। টিউশানি দেওয়ারও ক্ষমতা নেই আমাদের। আমি বিশেষ করে জবাব কথা বলি, —না, মেয়েটা তোমার কিন্তু খারাপ নয়। মেধা আছে। তবে মেয়েটা বড্ড কামাই করে। ইদানীং ওর ছোট বোনটাও কামাই করতে শুরু করেছে।

আজ দেখি হারুর শরীর আরও শীর্ণ। জিজ্ঞাসা করলাম, কী হারু তোমার শরীর এত খারাপ দেখছি। বড়সড় কিছু হলো কি? ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? কাছেই এত সুন্দর সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়েছে। সেখানে একবার দেখাও।

—দেখিয়েছি মাস্টারমশাই। ওষুধও দিয়েছে কিছু। কিন্তু সব ওষুধ তো আর হাসপাতালে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে কিনতে হবে। তা অত টাকা পাব কোথায়?

—জিজ্ঞেস করলাম— কী অসুখ হয়েছে তোমার?

কাশি দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, হাঁফানি। বড্ড কষ্ট হয় মাস্টারমশাই। আর পারি না।

—কতই বা বয়স তোমার। এই বয়সে একদম বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। তা তোমার জবা স্কুলে যাচ্ছে না কেন?

হারু ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, আর বলবেন না মাস্টারমশাই। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কাজটা চলে গিয়েছে ওর মা'র। তাই নিরুপায় হয়ে পূবে গেল কাজ করতে।

—পূবে কী কাজ?

—কত কাজ। আমাদের এখানকার মতো নাকি? ধান কাটা, ধান ঝাড়া, এরপর আলু লাগানো, তা মেয়েটাকে সেই সঙ্গে নিয়ে গেল।

কথাটা শোনার পর বড্ড রাগ হলো হারুর উপর। বললাম, তুমি জোয়ান মানুষ হয়ে ঘরের বউকে পাঠিয়েছ বাইরে কাজ করতে? আচ্ছা পুরুষমানুষ তো তুমি!

হারু যেন কিছুটা চুপসে গেল। লজ্জায় মাথা নত করল। আমি চলে আসছি গট গট করে। হারু পেছন থেকে ডাকল, মাস্টারশমাই।

—আমি ওর ডাকে কর্ণপাত না করে হাঁটতে থাকলাম। ও এবার দ্রুত ছুটে এল। আমার গতি রোধ করে দাঁড়াল একেবারে সামনে এসে। হাতজোড় করে বলল, মাস্টারমশাই, কিছু মনে না করলে বলি। ক'টা টাকা ধার দেবেন?

—টাকা ধার বল কী?

—শরীরটা বড়ই দুর্বল। ওষুধ খাব।

—কত টাকা?

—ওই শ' পাঁচেক।

বললাম, অত টাকা। মাসের শেষে পাব কোথা? এমনিতে আমার সংসারেও বড় টানাটানি। শ'খানেক টাকা তোমাকে দিতে পারি। ফিরে আবার বাজার করতে হবে। চলি। হারু ফের হাত জোড় করে বলল, শ' তিনেক টাকা অন্তত দেন। আমি দিন দশেকের মধ্যে শোধ করে দেব।

—আমি ভাবলাম, ও ছাড়ার পাত্র নয়। আর তাছাড়া এখনই কম করে দিলে ব্যাপারটা মিটে যাবে। বললাম, এই শ' দুয়েক টাকা আছে। এই নিয়ে চালাও এখন।

—আমি ওকে টাকা দিয়ে চলে আসছি। রামরতনবাবু আমার পেছন থেকে একেবারে ছুটে এসে বললেন, আপনিও ওর ফাঁদে পড়লেন। ওই টাকা দিয়ে ও ওষুধ খাবে কী? মদ খাবে, মদ। ওর ওষুধ তো মদ। আপনি জানেন না বুঝি?

বললাম, ওষুধ খাবার নাম করে যদি মদ কিনে খায় তাহলে কী আর করা যাবে বলুন। তাছাড়া আমরা মাস্টার মানুষ বিপদে-আপদে চাইলে একেবারে তো ফিরিয়ে দিতে পারি না। এমনিতেই মাস্টারমশাইদের নিয়ে লোকে কত কথা বলে।

—ছাড়ুন তো লোকের কথা। লোকে তো কত কথা বলে। ও মদ খায়। তবে কী বলুন তো— ও কী আর মদ খায়? মদ ওকে খায়। তাছাড়া ভালো বিলিতি মদ খেলে হতো। ও তো খায় চোলাই। সন্ধ্যা হলেই ওর ঠেক ওই খালপাড়ের কদমতলার ঝুপড়িতে। লোকের কাছে ওষুধ কিনব বলে টাকা নেয়, আর সন্ধ্যায় ওখানে দিয়ে আসে।

এর কিছুদিন পর আবার দেখি ভ্যানের উপর বসে ঝিমুচ্ছে। মুখে উসকো খুসকো একমুখ দাড়ি। চোখ দুটো ঘোলাটে। মুখের উপর মাছি উড়ছে। কথা বলার ইচ্ছে হলো না বলে দ্রুত নিজের মতো হেঁটে চলে আসছি। হারু ডাকল, কথা না বলে চলে যাচ্ছেন যে। আপনার টাকাটা আমি ঠিক দিয়ে দেব। এতটুকুন দেরি করব না। বললাম, ঠিক আছে তাই দিও। তা গতর খাটিয়ে দিও, ওদের উপর

ভরসা কেন?

—অমনি ভ্যান থেকে দ্রুত নেমে টলতে টলতে এসে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলল, শরীরটা ভালো নাই। কিছু টাকা দেন না মাস্টারমশাই। ওষুধ খাব। ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি। দেন না।

—আমি বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করেও জেনেছি, ‘‘কীরে তোর বাবা ওষুধ কিনে খেয়েছে?’’

—সরস্বতী বলেছিল, না গো মাস্টারমশাই।

—আমি আর ঠকতে চাইলাম না। বললাম— সব সময় কি টাকা থাকে? এখন যাও। পরে এসো। রামরতনবাবু এদিন আর ছুটে এলেন না বটে। নিজেই একটা গাছের ডাল ভেঙে বললেন, ছাড় মাস্টারমশাইকে। যেতে দে এবেলা।

—ভয়ে হারু পথ ছাড়ল বটে, কিন্তু হুংকারও ছাড়ল, দেখে নেব রামরতন। টাকা দিবি নে, টাকা অন্যকে দিতেও দিবি নে।

—আমি ভাবছিলাম, নেশা কী বিষম বস্তু। মানুষকে অমানুষ করে দেয়। পশুর অধম করে ছাড়ে।

এর বেশ কিছুদিন পরে শুনি জবার মা এসেছে। আমি কুসুমকে বললাম, ‘‘কী রে তোর দিদি আসেনি? পরীক্ষা তো সামনে।’’ কুসুম জবাব দিল, মা এবার আমাদের দুই বোনকে নিয়ে যেতে এসেছে।

—‘‘তাহলে কার্তিক, গণেশ কোথায় থাকবে?’’

—‘‘কেন ঠান্মার কাছে থাকবে। টুকটুকিকেও রেখে যাবে।

ওইটুকুনি দুধের শিশুকে রেখে মা কাজে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমার একদিন বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। বললাম, কী ডাক্তার, বৌদিকে এখন খুব খাটাচ্ছ বুঝি।

ডাক্তারবাবু বললেন, কী করব? কাজের লোক রেখেও যে খুব লাভ হয় তা নয়।

ওরা আজ আসে তো কাল আসে না। তারপর সময়মতো এলেও হয়। কোনও সকাল ৬টায় আসে তো ৯টায় আসে। আর দু’দিন অন্তর ওকে টাকা দাও। মাস শেষ হওয়ার আগেই— কত বাহানায় টাকা চাই।

—তা অন্য কোনও একটা কাজের লোক রাখলেও তো পারো দাদা।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তা ভাই তুমি কেন রাখছ না? বৌমাকেও তো তুমি কম কষ্টে রাখনি।

—আমি বললাম, আমার কথা ছাড়ুন। বড়ই অর্থসংকট দাদা। বাজারের যা পরিস্থিতি। সব অগ্নিমূল্য। এই বেতনে বাইরে থেকে সংসার চালানো বড়ই কষ্টকর। পঞ্চাশ শতাংশ ডিএ বাকি। নতুন পে কমিশন গঠন হয়েছে ঠিকই কিন্তু কার্যকরী হলো না। করি তো প্রাইমারি স্কুলে চাকরি। সরকার বাড়ালেও আমাদের আর ক’ টাকাই বা বাড়ে? তার আগেই সংসারের চাহিদা বাড়ে।

ডাক্তারবাবু বলেন, ঈষৎ মুচকি হেসে, তা ভাই আমাদেরও কি চাহিদা একজায়গায় স্থির থাকে? তাছাড়া আমাদেরও কিনে খেতে হয়। জল বাদে সব। দুটো ছেলেমেয়ে পড়ছে আমার বর্ধমান খড়্গপুরের মতো টাউনে। মেসে রেখে পড়ানো। সংসারের যা খরচ, সে ভাবে তো আর আয় নেই। আগে কারখানা চালু ছিল। বাইরে থেকে শ্রমিক কর্মচারী আসত। বাড়িভাড়া দিয়ে আমার সংসার চলে যেত। আর ডাক্তারির পয়সায় ওদের পড়াতাম। রোগী তখন ঠেলে পারতাম না। আর এখন। আর ভায়া বললে রাগ কর না, তোমার মতো ভদ্রগোছের লোকেরা আজকাল নিজেরাই ডাক্তার বনে গেছে। খুব একটা বড় গোছের না হলে ডাক্তার কাছে আসে না।

তারা বাজার থেকে বই কিনে কিংবা মোবাইলে নেট দেখে ওষুধ কিনে খায়। তাহলে ভাই বল, কাজের লোক না ছাড়িয়ে উপায় কী?

পাশের পান বিড়ির গুমটি থেকে মাঝবয়সী লোকটা বলল, সবারই এক অবস্থা দাদা। বিক্রিবাটা একদন নেই। কিছু হলে তো কিছু ছাড়বে লোকে। এর আগে সবাইকে সর্বস্বান্ত করল চিটফান্ড। আর এখন নোট বাতিল।

অপর একজন পাশে দাঁড়িয়ে পান চিবোতে চিবোতে উত্তর করল— নোট বাতিল আমার তোমার আর কী ক্ষতি করল? যাদের বিছানার তলায়, লকারে, আলমারিতে, বস্তায় ভরা টাকা থাকে— তাদের অসুবিধা হয়েছে। এরই মধ্যে দেখি জবার মা লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। ডাক্তারবাবু ‘যাই’, একটু তাড়া আছে বলে একপ্রকার পালিয়ে গেলেন ওদের দেখে।

আমাকে জবার মা কাছে এসে বলল, কী করব মাস্টারমশাই? ছেলে-মেয়ে গুলোকে মানুষ করার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মন্দ কপাল হলে যা হয়। ওর বাপকে তো মদেই খেয়ে নিয়েছে। আমি মা হয়ে ওদেরকে তো ফেলে দিতে পারিনে। দুবেলা দুটো ভাত ওদের মুখে যদি না তুলে দিতে পারি, তবে মা হয়ে তা সহ্য করি কী করে বলুন তো?

বললাম— এখানে থেকেও তো সে কাজ করতে পারতে।

—জবার মা বলল, পারতাম না মাস্টারমশাই। কাজ কোথায় এখানে যে কাজ করব? আমাদের দেশ তো ভিখিরির দেশ হয়ে গেছে না। বাস এসে গেছে মাস্টারমশাই। এই বাসটাতেই যাব।

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, জবার মায়ের পিছু পিছু জবার দুই বোনও বাসে ঠেলে উঠছে। কিছুদিন পর শুনলাম জবার মা জবা ও কুসুমকে ওই পূব দেশেই বিয়ে দিয়েছে। আমি ওদের মাস্টারমশাই হয়েও কিছুই করতে পারলাম না। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া। ∎

নবাঙ্কুর

মনীষী কথা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশভক্তি

পরাধীন ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্র বসু যখন জন্মেছিলেন এবং বড়ো হয়েছিলেন, তখন আমাদের দেশ পরাধীন ছিল। ছোটোবেলা তিনি মায়ের কাছে প্রতিদিন প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা শুনতে শুনতে নিজের মায়ের মতোই দেশকে ভালোবাসতে শুরু করেন। দেশমাতার কাজের জন্য নিজেকে সমর্পণ করার মন তিনি তখনই তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর কলেজের বন্ধুরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। দেশের সম্পর্কে কত উচ্চ চিন্তা তিনি পোষণ করতেন তা ১৯১২-১৩ সালে তাঁর মাকে লেখা একটি চিঠিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন — " আমাদের ভারতবর্ষ ভগবানের বড়ো আদরের স্থান। এই মহাদেশে লোকশিক্ষার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি অন্য কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড়ো আদরের দেশ।"

সাবমেরিনের ডেকে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে দেখছেন নেতাজী, নেতাজীকে দেখছেন ক্যাপ্টেন আর্নার মসেঁবার্গ।

কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্দশার চিত্র দেখে তিনি আবার মাকে লিখেছেন, " কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা, হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

দেশমাতৃকার প্রতি সুভাষচন্দ্রের এত প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল বলেই আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করার পরও সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি উপেক্ষা করে দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর এর প্রথম ও প্রধান প্রেরণাস্থল ছিলেন তাঁর মা। তিনি দেশজননী ও গর্ভধারিণী জননীকে এক মনে করতেন। ১৯২৫ সালে ১৬ ডিসেম্বর মান্দালয় জেল থেকে মেজবৌদি বিভাবতী বসুকে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, "এক বৎসর কাল দেশান্তরী হইয়া আমি অনুভব করিতেছি আজ আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আজ মনে হইতেছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালোবাসি, জীবনে এত ভালোবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়— সে কী আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাহিরে দেশ ছাড়া— কিন্তু অন্তরের মধ্যে , কল্পনার মধ্যে দেশকে পাইয়া থাকি। আর সেই পাওয়ার মধ্যে কী কম আনন্দ?"

দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি মহা বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ডাকে দেশ ছেড়েছিলেন। বাড়ি ছাড়ার দিন অত্যন্ত গোপনে গভীর রাতে ঘুমন্ত মাকে দূর থেকে প্রণাম করেছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে যুদ্ধ চলছে। সাবমেরিনে জার্মানি থেকে জাপান যাচ্ছেন। সাবমেরিনের চালক হঠাৎ বলে উঠলেন, মিস্টার বোস, আমরা এখন কেপ কুমারিন অতিক্রম করছি। সুভাষচন্দ্র চমকে উঠলেন— কেপ কুমারিন তো কন্যাকুমারী! মানে তিনি ভারতবর্ষের কাছে দিয়ে যাচ্ছেন। ক্যাপ্টেনকে বললেন সাবমেরিনটিকে উপরে ওঠাতে। কত দিন হয়ে গেল তিনি দেশজননীকে দেখেননি। ক্যাপ্টেন বুঝাতে চাইলেন ওপরে ওঠা মানে ভীষণ বিপদ। ক্যাপ্টেনের কোনও কথাই তিনি শুনতে চাইলেন না। শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর আবেগ দেখে ক্যাপ্টেন সাবমেরিনটি উপরে তুললেন। সুভাষচন্দ্র ডেকের ওপর থেকে সামনে সমুদ্রে ভাসমান মানচিত্রের মতো ভারতবর্ষকে প্রণাম করছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদছেন। ক্যাপ্টেন অভিভূত হলেন। তিনি সাবমেরিনটিকে আবার জলের ভিতর ডুবিয়ে নিলেন।

শয়নে-স্বপনে, কল্পনায়, জাগরণে সব কিছুতেই দেশই ছিল সুভাষচন্দ্রের সাধনার ধন।

রাজদীপ মিশ্র

ভারতের পথে পথে

কুম্ভকোণম্

কাবেরী নদীর তীরে পুরাণখ্যাত মন্দির শহর কুম্ভকোণম্। এখানে বর্ণময় কারুকার্য খচিত ৩৯ টি মন্দির রয়েছে। এক সময় চোলরাজাদের রাজধানী ছিল। জনশ্রুতি, অমৃতকুম্ভের দখল নিয়ে দেব-দানবের সংঘাতের সময় শিবের ছোড়া তীরে কুম্ভের কানা ভেঙে পড়ে শহরের দক্ষিণ-পূর্বের মহামহম সরোবরে। কুম্ভের ভাঙা কানা থেকে শিবলিঙ্গ তৈরি হয়। প্রতি মাঘ মাসে এখানে মেলা বসে। বারো বছর অন্তর আসে পূর্ণকুম্ভস্নান যোগ। এখানকার জ্যামিতিক ছকে গড়া কুম্ভেশ্বর শিবমন্দিরে বছরের বিশেষ দিনে সরাসরি শিবলিঙ্গে সূর্যকিরণ এসে পড়ে। এছাড়া এখানকার ব্রহ্মামন্দির, চক্রপাণি মন্দির, রামস্বামী মন্দির, নাগেশ্বর মন্দির, শঙ্করাচার্যের মঠ এবং শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মভূমি উল্লেখযোগ্য। সারা বছর দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থী ও বিদেশি পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে।

জানো কি?

- বসন্তকালে দুর্গাপূজা প্রথম করেন রাজা সুরথ।
- শরৎকালে করেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র।
- চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই অসুরকে বধ করে নাম হয় চামুণ্ডা।
- মা দুর্গার আর এক নাম শাকম্ভরী।
- দুর্গ নামক অসুরকে বধ করে নাম হয় দুর্গা।
- মতান্তরে জীবের দুর্গতি নাশ করেন তাই দুর্গা।
- বসন্তকালে হয় বলে বাসন্তীপূজা বলা হয়।

ভালো কথা

সেবাকাজের অনন্য নজির

মানুষের বিপদের দিনে সহযোগিতা করাই যে মনুষ্যত্বের পরিচয় তা করে দেখাল ব্যারাকপুরের নিমতার একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী বৃষ্টি দাস। বৃষ্টি তার জন্মদিনে পাওয়া টাকার সমস্তটাই কেরলের বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করেছে। টিভিতে কেরলের বন্যার ছবি দেখে বৃষ্টির মন ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু করার কোনও উপায় ছিল না। তার ঠাকুর্দা ও বাবা রিকশা চালিয়ে সংসার চালান। তবুও সুযোগ এসে গেল। বাবাকে বলে সে তার জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা করল। সবাইকে বলা হলো জিনিসপত্র দিতে হবে না, শুধু টাকা দিতে হবে। সবাই ভাবলো বুঝি মোবাইল কেনার শখ হয়েছে। সবার ভুল ভাঙল যখন বৃষ্টি ঘোষণা করল জন্মদিনে পাওয়া ৫০০ টাকা সে কেরলের বন্যাদুর্গতদের জন্য দান করবে। আর তখনই সবাই তাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করে। আসলে বৃষ্টির প্রেরণাদাতা হলেন ওর গৃহশিক্ষক সত্যজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

দেবজ্যোতি সাহা, একাদশ শ্রেণী, নিমতা, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ভূমিকম্প

প্রিয়াংশু সিংহ, একাদশ শ্রেণী, পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

বাজছে শাঁখ, উলুধ্বনি
দুলছে পাখা, নড়ছে জল
সবাই বলছে ভূমিকম্প
ঠাকুমা বলছে হরি হরি বল।
ভয়ে কাঁপছি আমরা সবাই
মা বলছে কোথায় যে যাই
বাবা বলছে কোনও ভয় নাই
দিদি বলছে কোথায় যে লুকোই!

ছোটকা তখন দৌড়ে এসে
একটুখানি মুচকি হেসে
বললে ভূমিকম্প নয়, মা আসছে
পায়ের চাপে দেখে নিচ্ছে।
মায়েরও তো আছে ভয়
সবাইকে নিয়ে চলতে হয়
ভাঙছে ব্রিজ যেমন ভাবে
পুজোর তবে বারোটা বাজবে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

মায়েরাই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী

সুতপা বসাক ভড়

গত কয়েক দশক ধরে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অলিখিত নিয়ম চালু হয়েছে— তা হলো বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছাড়াও প্রায় প্রতিটি বিষয়ে এক বা একাধিক শিক্ষকের কাছে টিউশন বা কোচিং নেওয়া। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই সকালে একদফা টিউশন সেরে বিদ্যালয়ে যায়। সেখান থেকে ফিরে লাগাতার আরও দু-তিনটি জায়গায় পড়া সেরে তারপর বাড়ি। তারপর ক্লান্ত শরীরে বই খুলে বসেও খুব একটা পড়া হয় না। কোনোরকমে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম। পরের দিন সকাল থেকে আবার একই দিনচর্যা। অনেকক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকেরাও নিজেদের কাজকর্ম, বিশ্রামাদি জলাঞ্জলি দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সকলরকম অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই পদ্ধতিটি কি আদৌ একান্ত প্রয়োজনীয়?

এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীর দিক থেকে বিচার করলে দেখব যে, তারা কীভাবে শিক্ষকদের ওপর অনাবশ্যক নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না রেখে শিক্ষকদের বেছে দেওয়া কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে পরীক্ষায় বসতে যায়। হয়তো বা পাশও করে, কিন্তু ওই শ্রেণীর ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান তার মধ্যে থাকে না। একজন অভিভাবক জানালেন, তাঁর সন্তান একই বিষয় তিনজন শিক্ষকের কাছে পড়ে--- প্রথম শিক্ষক বিদ্যালয়ের : তাঁর কাছে পড়লে নম্বর বেশি দেবেন; দ্বিতীয় শিক্ষক খুব ভালো করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন এবং তৃতীয় শিক্ষক খুব ভালো 'নোট্স্' দেন— অগত্যা! এক্ষেত্রে অনাবশ্যক সময় এবং অর্থ উভয়ই শিক্ষার্থীকে এবং তার পরিবারকে দিতে হয়। উপরন্তু বিদ্যার্থী আত্মনির্ভর না হয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন শুরু করছে। ভবিষ্যতেও তার চরিত্রের মধ্যে এই দিকটি তাকে এগিয়ে যেতে বাধা দেবে। তার মধ্যে স্বাধ্যায়ের অভ্যেসটি জন্ম নেবে না। অথচ, ভবিষ্যতে বড় বড় পরীক্ষায় (পাঠ্যক্রম সম্বন্ধিত বা প্রতিযোগিতামূলক) স্বাধ্যায় একটি মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেজন্য এইভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সময় এবং অর্থের অপচয় না করে যেসব শিক্ষার্থীরা ওই সময় ঘরে বসে পড়াশুনা করে, তারা অনেক ভালো ফল করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

অঙ্গনা

সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার পেছনে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। সত্যি কথা বলতে, নার্সারি, কেজি থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সন্তানদের পড়াশুনার দেখাশুনা করতে মায়েদের থেকে ভালো আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে কোনো উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও একজন মায়ের সমকক্ষ হতে পারবেন না; কারণ সন্তানকে মায়ের থেকে ভালো কেউ চেনে না।

আমাদের পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল— এই বিষয়ে বাচ্চাদের বইগুলি মায়েরা যদি কয়েকবার পড়ে রাখেন, তাহলে অনায়াসেই তাদের বুঝিয়ে দিতে পারবেন। পরীক্ষার অভ্যেসের জন্য বইয়ের পেছনে দেওয়া প্রশ্নাবলী, বাজারে উপলব্ধ প্রশ্নোত্তরের বই এবং সর্বোপরি ইন্টারনেটের সাহায্য সহজেই নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া পড়া বোঝানোর বিষয়ে অনেক ভিডিও ইউটিউবে সহজলভ্য--- আজকালকার মায়েরা অনায়াসেই সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যে মায়েরা বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন, তাঁদের পক্ষে সন্তানদের বিজ্ঞান এবং অঙ্কের মত বিষয়ের দেখাশুনা করা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইংরাজি এমন কিছু কঠিন নয়, যাতে একজন মা তার সন্তানকে সাহায্য করতে অপারগ হবেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আছেন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য। সুতরাং, মায়েরা যেসময় অনাবশ্যক ফেসবুক, হোয়াট্স্ অ্যাপ ইত্যাদিতে অপচয় করেন বা সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন কোচিংয়ে ঘুরতে থাকেন, সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের অনেক বেশি মঙ্গল করতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র সচেতনতা, ধৈর্য এবং সহনশীলতার।

সন্তান যখন মার কাছে বসে, তাঁর পরামর্শ নিয়ে পড়াশুনা করে তখন তার ফল অনেক ভালো হয়। মার সঙ্গে সন্তানের মানসিক ভারসাম্য সহজাত, এর ফলে বিদ্যার্থীর সময় পরিশ্রম বেঁচে যায় এবং তার পড়াশুনার মান উন্নততর হয়, সন্তানের সঙ্গে মা'র মানসিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, মাকে সে আরও সম্মান করে ও ভালোবাসতে থাকে; সর্বোপরি তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। সে মানসিক ভাবে দৃঢ় হয়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই পাঠাভ্যাস তাকে সাহায্য করবে। কারণ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষায় ভালো ফল করে, তারা বেশিরভাগই কোচিংয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়, তাদের জীবনে স্বাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে।

সেজন্য মায়েরা একটু ভাবুন, সন্তানদের জন্য সময় দিন। এর ফলে আপনারা সংসারের অর্থ সাশ্রয় করে মা-লক্ষ্মীর এবং পড়াশুনায় সাহায্য করে মা-সরস্বতীর ভূমিকা নিতে পারেন। সন্তানও সারাদিন এদিক-ওদিক না ঘুরে বিদ্যালয় ও বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে ভালো ফল করবে, মা'র সান্নিধ্যে থাকলে কুসঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায় এবং পরিবারে শান্তি বজায় থাকে। অনেক মা নিজেরাই স্বাভাবিকভাবে সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন— তাঁরা সত্যিই ধন্যবাদার্হ। সন্তান, পরিবার, সমাজ ও দেশের মঙ্গলসাধনে এইসব মায়ের ভূমিকা অপরিসীম--- তাঁরাই হলেন একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।■

সংস্কার ভারতীর নৃত্যনাট্য ‘হৃদি গোবিন্দম্’

তিলক সেনগুপ্ত।। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে যে দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে বাঙালি চিত্তকে রসাপ্লুত করেছিল, তার অন্যতম বৈষ্ণব পদাবলী। বাঙালির চিত্ত কোনোদিনই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রাখেনি, বরং প্রণয়ের নৈকট্য ঈশ্বরকে নানা সম্পর্কের বাঁধনে তাদের বিধৃত করেছে।

‘দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা'--- এই চেতনা মানবিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনাকে সূচিত করে। জয়দেব বা বিদ্যাপতির পূর্বে পুরাণ বা ভাগবতে যে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে, সেখানে রাধা-কৃষ্ণের ঐশ্বর্য লীলার প্রকাশ। জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রথম দুই পদকর্তা যারা রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের চেয়ে মাধুর্য্যভাবকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাধক কবি জয়দেব গোস্বামীর শ্রী গীতগোবিন্দমে প্রথম শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধ্যে মাধুর্যভাবের মূর্তবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে মানবিকতার স্তরে নামিয়ে এনে প্রেমের সর্বোচ্চ মূল্য দান করলেন কবি। কিন্তু তার মনের সংশয় দূর করতে স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন। স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেলেন কবি জয়দেবের সাধনার সম্পদ— ‘দেহি পদ পল্লব মুদারম্’।

সারস্বত সাধকের এই অভিনব প্রকাশকে প্রণাম জানাতেই ভারতীয় চিরন্তন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সিউড়ি ‘সংস্কার ভারতী’, প্রিয় দর্শকদের সামনে নিবেদন করেছে মনোগ্রাহী নৃত্যনাট্য ‘হৃদিগোবিন্দম্’। বাংলার বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামীর জীবনকথা।

রূপের আড়ালে যেমন অরূপ বিরাজ করে, তেমনি সৃজনের পূর্ব ও মধ্যবর্তী অধ্যায় নিয়ে সম্পূর্ণ হয় সার্বিক সৃজনকথা। তৎকালীন সমাজকে কেন্দ্র করে পারমার্থিক আকুতি, ধর্মশাস্ত্র, উচ্চাঙ্গের কাব্য গীতের মধ্য দিয়ে ‘হৃদিগোবিন্দম্’ যথাযথ ভাবেই দ্বাদশ শতকের বাংলাকে নৃত্য, গীত, নাটকের মাধ্যমে প্রতিফলন করে।

গীতগোবিন্দ দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবের অমর সৃষ্টি। সাধক কবি জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দম আজও বাংলাতেই প্রচারের আলোয় আসেনি। সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা আমাদের বাংলার এই কবিকে, তাঁর কাব্য প্রতিভাকে নতুন আঙ্গিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে এই নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে। সমস্ত নৃত্যনাট্য পরিবেশনায় লক্ষণীয় ধ্রুপদী ও

সৃজনশীল নৃত্যের সহাবস্থান। কবি জয়দেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং গীতগোবিন্দম্ এই নৃত্যনাট্যের মূল উপজীব্য।

নাট্য ও নৃত্যশৈলীতে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। নাট্য সূচনায় কেন্দুলি গ্রামে মন্দির অঙ্গনে পরিবেশিত কত্থক নৃত্যে সনাতনী নৃত্য ঘরানার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কত্থক, ভরত নাট্যম, ওড়িশি ও গৌড়ীয় নৃত্য শৈলীর মত ধ্রুপদী নৃত্য আঙ্গিকের পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে লোকায়ত নৃত্যের ভাবাদর্শ। নৃত্যনাট্যে পরিলক্ষিত হবে রাইবেঁশে এবং গ্রাম বাংলার প্রভাতীকীর্তন সুরের মূর্চ্ছনা।

গীতগোবিন্দ রচনার পূর্বে কবি জয়দেবের চিত্তলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল এক অতীন্দ্রিয় চেতনায়। জয়দেবের কবিচেতনা ঐহিক ও পারমার্থিক ভাবাদর্শের এক অপূর্ব মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছিল বলেই গীতগোবিন্দম্ এত সার্থক, এত রসগ্রাহী— কালের সীমানা পেরিয়ে আজও এত প্রাসঙ্গিক। তাই কবি জয়দেবের জীবন চরিত ও অমর সৃষ্টি গীতগোবিন্দম্ আধারিত নৃত্য ও নাট্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ‘হৃদিগোবিন্দম্’ দর্শকমনে সেই ভাবাদর্শ পরিবেশনে অনেকখানি সফল।

মধ্যযুগের সংস্কৃত কবি জয়দেব গোস্বামীর জীবনের নানা বাঁক নৃত্যনাট্যের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। ভরতনাট্যম্, কত্থক, ওডিশি ধ্রুপদী নৃত্যের পাশাপাশি গৌড়ীয় নৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য ও প্রভাতী গান আলাদা মাত্রা এনে দেয় এই নৃত্যনাট্যে। কাব্য ছন্দে রচিত হৃদিগোবিন্দম্ অথঃ জয়দেব চরিতম্ নৃত্যনাট্যে গানে সুরারোপিত করেছেন ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। এই নৃত্যনাট্যের বিষয়ে গবেষণা ও সামগ্রিক পরিকল্পনা করেছেন তিলক সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, রাধা কৃষ্ণ মাধুর্য ভাবকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দম্-এর মাধ্যমে। কিন্তু তিনি চিরকাল উপেক্ষিত থেকেছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে কবি জয়দেব নিয়ে আগ্রহ তৈরি ও জয়দেবের ভাবাদর্শকে ও গীতগোবিন্দম্-এর মাধুর্য জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে এই ধরনের প্রয়াস। জয়দেব গোস্বামীকে নিয়ে গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে এই নৃত্যনাট্যের মূল বিষয়।

নৃত্যনাট্যটি কাব্য ছন্দে রচনা করেন স্বরূপ সরকার।

মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্তের পরিচালনায় ৬০ জন শিল্পী এই নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে। জয়দেবের ভূমিকায় স্মিতা মুখোপাধ্যায় ও পদ্মাবতীর ভূমিকায় মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্তের অসাধারণ অভিনয় ও নৃত্যশৈলীতে মুগ্ধ হন দর্শকরা। নৃত্য, গান এবং কবিতা পাঠে জয়দেবের জীবনকাহিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। এই মৌলিক প্রযোজনায় কবি জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দম্ রচনা ও তার জীবন কাহিনি তুলে ধরা হয় নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে।

নৃত্য নির্দেশক মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্ত বলেন— কবি জয়দেবকে নিয়ে ওড়িশায় অনেক গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। অথচ বীরভূমের এই কবিকে নিয়ে সেই অর্থে কাজ খুব কম হয়েছে। তাই কবি জয়দেব এর জীবন কাহিনি এবং গীতগোবিন্দের কথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য এই উদ্যোগ। ▌

অন্য রকম

চরকা যে গ্রামের ঘুরে দাঁড়ানোর হাতিয়ার

অম্লানকুসুম ঘোষ॥ বর্তমান যুগ গতির যুগ, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের বোতামে চাপ দিয়ে এক নিমেষে অনেক কিছু করে ফেলার যুগ। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রনির্ভর এই যুগের অনেক সুবিধা যেমন আছে তেমনই আছে অনেক অসুবিধা, যেমন কর্মচ্যুতি। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র করে দিচ্ছে অনেকের কাজ, ফলে প্রচুর শ্রমিক বিশেষ করে অশিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছেন। ভারতের মতো অধিক জনঘনত্বের এবং প্রযুক্তি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ দেশে এই কর্মচ্যুতির সমস্যা অনেক বেশি, কর্মচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা যত বাড়ে কর্মপ্রার্থীর দলও তত ভারী হয় আর কর্মদাতার মুখের হাসিও ততই চওড়া হয়। চাহিদা-জোগানের অর্থনীতির নিয়মেই তারা কম বেতনে অনেক বেশি কাজ করিয়ে নিতে পারেন এই সব কর্মপ্রার্থীদের দিয়ে। তাই তো আমরা দেখি ঝাঁ চকচকে অফিসে অতি অল্প বেতনে স্বচ্ছতার কাজে নিযুক্ত কিছু ব্যক্তিকে, তাদের পাশেই মোটা বেতনকাঠামোয় অভ্যস্ত ব্যক্তিবর্গ নিত্যদিন এদেরকে দেখেন নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কোথায়? এই ব্যস্ত জীবনে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে এই হতভাগ্যদের কথা চিন্তা করার সময় কি কারো আছে?

কিন্তু ঘন তমসাবৃত রাত্রির পরেই আসে রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত। 'হারা শশীর হারা হাসি' তো 'অন্ধকারেই ফিরে আসে'। যান্ত্রিক এই যুগেও এখনও অনেকে অন্যরকম ভাবেন। তাই তো মাঝেমাঝে দেখা যায় অন্যরকম দৃশ্য। যেমন দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম মন্মথপুরে। সুন্দরবনের উপকণ্ঠে অত্যন্ত দরিদ্র একটি গ্রাম। যোগাযোগব্যবস্থার অবস্থাও তথৈবচ। আয়লা-পরবর্তী সুন্দরবনের বিধ্বস্ত কৃষিব্যবস্থাই সেখানকার বেশিরভাগ মানুষের একমাত্র পেশা। দৈনিক ১০০ টাকার কম। কিন্তু আজ সেই গ্রামে গেলে যে কেউ দেখতে পাবেন সকলের মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। সকলের ব্যবহারে দেখতে পাবেন স্বনির্ভরতার নিশ্চয়তা। চরকার ঘর্ঘর ধ্বনি স্বাগত জানাবে আগন্তুককে। গ্রামের চরকাগৃহে গিয়ে আগন্তুক বিমুগ্ধ নয়নে লক্ষ্য করবে প্রায় সত্তর আশি জন মহিলা একসঙ্গে চরকা চালাচ্ছেন। চরকার চাকা ঘোরার পাশাপাশি এই গ্রামের হতদরিদ্র মানুষগুলোর ভাগ্যের চাকাও ঘুরছে সুখের দিকে।

কিন্তু কীভাবে হলো এই অসাধ্য সাধন? এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ পেতে হলে শুনতে হবে সেই ব্যতিক্রমী পথ চলার গল্প।

নিজের অফিসে বেশ কিছু ব্যক্তিকে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে অস্থায়ী কর্মীদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দেখে এক ব্যক্তির মাথায় হঠাৎ ভিড় করেছিল একগুচ্ছ প্রশ্ন। এদের অবস্থার কি উন্নতি করা যায় না? বিকল্প কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি করা যায় না এদের জন্য? পরাধীন দেশের বিদেশি শাসকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তবে কী লাভ হলো আমাদের? প্রশ্নের হাত ধরেই এলো উত্তর, ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যেমন গান্ধীজী চরকা নিয়ে কুটির শিল্পের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেরকমই এখনও চরকার সাহায্য নিয়ে কিছু করা যায় কি? ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। প্রশ্ন থাকলে উত্তরও পাওয়া যায়। উত্তর পাওয়া গেল সেই চরকার মাধ্যমেই। চরকার দ্বারা সুতো কাটার কাজ দিয়ে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। চিন্তার গতিপথ এদিকেই এগোল। এই চিন্তাকে হাতিয়ার করেই খাদি বোর্ড এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাহায্যে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সত্যরঞ্জন মহাপাত্র, দেবব্রত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নির্মল মাইতি প্রমুখ নিরলস কর্মযোগী। তাঁদেরই উদ্যোগে আজ গ্রামটির ঘরে ঘরে স্বনির্ভরতার আনন্দ, স্বাবলম্বনের তৃপ্তি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাদের প্রণব মন্দিরে জায়গা দিয়েছে চরকা ঘর করার। খাদি বোর্ড নিয়মিত তুলোর জোগান দিচ্ছে। সুতোও কিনে নিচ্ছে তারা। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সরাসরি চলে যাচ্ছে তাদের ব্যাঙ্ক খাতায়।

ষাটোর্ধ্ব ইন্দ্রাণী দাস তাই জানালেন এতদিন লোকের বাড়ি কাজ করে সামান্য আয় হতো, এখন খাদির কাজ করে মাসে তিন হাজার টাকার কাছাকাছি আয় হচ্ছে। সংসারেও কিছু দিতে পারছি। পঞ্চাশোর্ধ কনক মিশ্র ও ভারতী সর্দার বললেন, এতদিন সামান্য কিছু টাকার জন্য তিন চার ঘণ্টা জার্নি করে কলকাতায় পাড়ি দিতে হতো, এখন গ্রামে বসেই উপার্জন করছি। চল্লিশোর্ধ মলিনা বেজ ও দিপালি পাড়ুয়া বললেন, অভাবের সংসার কিছু না কিছু অভাব লেগেই থাকতো, আমরা সংসারে কিছু দিতেও পারতাম না, এখন সংসারে কিছু দিতে পারছি। সংসারে অভাব ঘুচেছে আবার হাতেও কিছু থাকছে। এতদিনকার অভাব পীড়িত ক্লিষ্ট মুখগুলিতে আনন্দমিশ্রিত চরকা হাসি ফুটিয়ে দিয়েছে। ■

মহান কর্মযোগী বসন্তরাও ভট্ট

বলরাম সাঁতরা

'ভুলিও না— জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।' বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের এই অমোঘ বাণী নিজের জীবনে যথার্থ ভাবে মূর্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ মাইনের চাকুরি পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রসেবার মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন যে কর্মযোগী তিনি শ্রদ্ধেয় বসন্তদা— বসন্ত বিনায়ক ভট্ট। বিগত অর্ধশতবর্ষে সঙ্ঘজীবনে অনেক সঙ্ঘ-প্রচারক এবং কার্যকর্তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে শ্রদ্ধেয় বসন্তদাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। জীবনে চলার পাথেয় অনেকটাই পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালিক কার্যকর্তার নানাপ্রকার দায়িত্ব পালনের কারণে আমার তাঁর কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বসন্তদাকে সর্বপ্রথম দর্শন লাভের সুযোগ হয় কিশোর থেকে তরুণ স্বয়ংসেবকে উপনীত হবার সময়ে। তাঁর সর্বপ্রথম প্রবাস বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া গ্রামের শাখায়। সাল ১৯৬৭ হবে। বসন্তদা বাস থেকে নামলেন একটি ছোট ব্যাগ ও একটি বাঁশের লম্বা হাতলওয়ালা ছাতা নিয়ে। সাধারণ পোশাক— ধুতি এবং ফুল শার্ট। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল মুখণ্ডল আকর্ষিত করেছিল তাঁর সরল সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি। তিনি তখন পশ্চিমবাংলার প্রান্তীয় প্রচারক। সেদিন একজন স্বয়ংসেবকের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্নান করার সময় নিজের হাতে নিজের জামা-কাপড় পরিষ্কার করে নিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে আহ্নিক। বিশ্রাম মাত্র পনেরো মিনিট। বাড়ির বৈঠকখানাতে বৈঠক হলো শিক্ষক, মুখ্য শিক্ষকদের সঙ্গে। প্রায় দেড় ঘণ্টা একই ভাবে বসে বৈঠক নিলেন। সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকদের শারীরিক কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন। শাখা শেষ হবার পনেরো মিনিট পূর্বে উপবিশ করে একটি সমবেত গীতের পর পরিচয় নিয়ে স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘ সম্পর্কিত কয়েকটি কথা বললেন। তাঁর ছিল খুব শৃঙ্খলিত জীবনচর্যা। ভোর চারটায় শয্যাত্যাগ, একঘণ্টা ব্যায়াম, দু'বেলা আহ্নিক, নিয়মিত দিনলিপি লেখা। অনেক পরে এসব জেনেছি, তাঁর আত্মা শরীর ছেড়ে যাবার পরে। প্রচারক হিসেবে পশ্চিমবাংলায় প্রথমে তাঁকে হুগলী বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি শ্রীরামপুরে এবং উত্তরপাড়ায় শাখা শুরু করেন। ওই সময় থাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আর্থিক সঙ্গতি ছিল না সঙ্ঘের। বেশ কিছুদিন তিনি শ্রীরামপুর রেলস্টেশনের প্লাটফর্মেই রাত কাটিয়েছেন এবং অর্থাভাবে অনেক সময় ছোলাভাজা খেয়ে দিন-রাত্রির আহার সমাপন করেছেন।

দুই দশকের অধিক সময় সঙ্ঘকাজের দায়িত্বে থাকার পর অন্যপ্রকার কাজে নিয়োজিত হলেন। সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার— বনবাসী ক্ষেত্রের কাজ। বনবাসী সমাজ যে হিন্দু সমাজের অভিন্ন অঙ্গ, বনবাসী সমাজ এবং বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে সে অনুভূতি জাগ্রত করা। মাধ্যম নানা প্রকার সেবা প্রকল্প চালনা করা। প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন কার্যকর্তার। বিস্তীর্ণ এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো তাঁকে। অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডিতে একটি ছাত্রাবাসের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা হয়। তিনি কার্যকর্তার অন্বেষণে ছিলেন। আমি সঙ্ঘ প্রচারক থেকে পারিবারিক কারণে বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় বসন্তদা অবগত হয়ে আমাকে কিছুদিন কল্যাণ আশ্রমের কাজে সময় দেওয়ার জন্য বললেন। বসন্তদার অনাড়ম্বর নেতৃত্বে কাজ করার একটা অন্যরকম আনন্দ। আমার কাছে ছিল সেই মোহ। সেই মোহে আকৃষ্ট হয়ে কল্যাণ আশ্রমের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। যে পারিবারিক কারণে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিছু দিনের মধ্যে তার সমাধান হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে প্রায় তেইশ বছর কাজ করতে পেরে ধন্য হয়েছি। তাঁর জীবনের নানান ঘটনা প্রতিটি সমাজ কর্মীর জীবনে প্রেরণার পাথেয়স্বরূপ। সাদা-মাটা নির্লিপ্ত জীবন, চারটি ভাষায় অনর্গল বার্তালাপ করতে পারতেন। মাতৃভাষা মারাঠি। হিন্দি, ইংরেজি এবং কর্মভূমির ভাষা বাংলা। দিনলিপি বাংলা ভাষাতেই লিখতেন। বাংলামায়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর কল্যাণ আশ্রমের কার্যালয় হয়েছিল কলকাতায় বড়বাজারে বাঙ্গুর ভবনের তৃতীয় তলার একটি কামরায়। সেই কামরাটিতে শৌচালয়, স্নানাগার বা রন্ধনশালা ছিল না। তিনি সেখানেই শয়ন করতেন। যেদিন দায়িত্ব ঘোষণা হয় সে দিনই তিনি ব্যাগ ও বিছানা সঙ্ঘ কার্যালয় থেকে নিয়ে এসে বাঙ্গুর ভবনের নির্দিষ্ট কামরাতে রাখেন।

মনের মধ্যে কোনো বিকার লেশমাত্র ছিল না। কোনও হীনম্মন্যতা বা দুঃখ তো ছিলই না। কামরার বাইরে সর্বসাধারণের জন্য শৌচালয় ব্যবহার করেছেন। সমস্ত বিষয়ে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা ছিল একশো ভাগ। অখণ্ড ধ্যেয়নিষ্ঠা ও কর্মের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন পদে পদে। অভাবনীয় ছিল তাঁর জীবন দর্শন। 'আপনি আচরিধর্ম অপরে শেখাও'-এর মতো। খুব কম মানুষই পারেন এভাবে নিজের জীবন গড়তে। বাগমুণ্ডিতে যখন ছাত্রাবাস শুরু হয় তখন কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল না। প্রায় পাঁচ বছর পর সে ব্যবস্থা হয়েছিল। অতি ভোরে জঙ্গলে শৌচকর্ম সারতেন। প্রথম কয়েক বছর বিদ্যুৎ ছাড়া ছাত্রাবাস চলেছে। গ্রীষ্মকালে অসুবিধা হলেও বসন্তদার প্রবাস নিয়মিত থাকত। বাঙ্গুর ভবনে থাকাকালীন এক স্থানীয় কার্যকর্তার বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন। রাত্রির আহার দোকানে দুধ-পাউরুটি দিয়ে সারতেন।

প্রসিদ্ধি পরাঙ্মুখ ছিলেন বসন্তদা। বাগমুণ্ডি ছাত্রাবাসের উদঘাটন অনুষ্ঠান ছাত্রাবাস সংলগ্ন একটি খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অন্য শিক্ষক, স্থানীয় নাগরিক ও অভিভাবকরা। তিনি কার্যকর্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন কার্যক্রমে বক্তব্য রাখার জন্য আর নিজে ছাত্রাবাস পাহারা দিচ্ছেন। আত্মপ্রচারে ছিল তাঁর তীব্র অনিহা। অযোধ্যা পাহাড়ে বস্ত্র বিতরণ চলছে। তিনি উপস্থিত আছেন। আমাদের ইচ্ছা তিনি বিতরণ করছেন এরূপ একটি ছবি তোলার। তিনি কিছু না বলে হেসে সে স্থান থেকে সরে গেলেন। তাঁর জীবনদর্শন ছিল সংগঠনের কাজ করতে হবে নাম যশের মোহে নয়, ভিতের পাথরের ন্যায়; মন্দিরের চূড়ার কলসের মতো নয়। মন্দিরের ভিতের পাথরের মতো যাকে কেউ দেখবে না, কিন্তু তা মন্দিরকে মজবুত ভাবে ধরে রাখবে। নিজের নাম যশ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী উল্লেখ করতেন— ''সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন কাম-কাঞ্চন পরিত্যাগ করার পরেও অবশেষে নাম যশের লোভে আটকা পড়ে যান। মহৎ হৃদয়ের শেষ দুর্বলতা হচ্ছে নাম যশের আকাঙ্ক্ষা।'' শ্রদ্ধেয় বসন্তদাকে এরূপ দুর্বলতা কখনও গ্রাস করতে পারেনি।

ত্রিপুরায় কার্যকর্তার প্রয়োজন হওয়ায় ১৯৮৯-এর জানুয়ারিতে বসন্তদার সঙ্গে ত্রিপুরায় গেলাম। তৈদুবাড়ি ছাত্রাবাস আগরতলা থেকে ষাট কিলোমিটার। অনেকটাই জঙ্গল ও আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ। সময় লাগল আড়াই ঘণ্টা। এখানে ছাত্র ও কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বসন্তদা। জানুয়ারি মাস, ঠাণ্ডা খুব বেশি, তার উপর বাঁশের বেড়ার ঘর। ঠাণ্ডা বাতাসের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। সেদিনই ঠিক হয়েছিল পরের দিন ওখান থেকে প্রায় ছ' কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রাম পঙ্কুবাড়িতে একটি এক শিক্ষক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাব। সম্পূর্ণ পথ পদব্রজে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। প্রায় মধ্যাহ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। গিয়ে শুনলাম বিদ্যালয়ের শিক্ষক কোনও কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গেছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। কার্যকর্তার বাড়িতে মা ছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করলেন স্বল্প সময়ের মধ্যে। সন্ধ্যায় গেলাম তৈদুবাড়ি ছাত্রাবাসে।

বসন্তদার পরবর্তী প্রবাস তৈদুবাড়িতে হয়েছিল গ্রীষ্মকালে। সেবারে হঠাৎ সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। আগরতলায় ফিরে আসা খুব জরুরি। এ কারণে সকাল থেকে চেষ্টা করেছি গাড়ির জন্য। একটি পুলিশের জিপ তেলিয়ামুড়া যাচ্ছে। কল্যাণ আশ্রমের প্রভাব থাকায় দুজনের বসার স্থান পাওয়া গেল। তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা যাওয়ার জন্য একটি লরি পাওয়া গেল, কিন্তু চালকের পাশে কোনও বসার স্থান ছিল না। লরিটিতে লবণের বস্তা বোঝাই ছিল। অতি কষ্টে বসন্তদা লবণের বস্তার উপর বসলেন। এই বয়সে বসন্তদার এরূপ কষ্টকর প্রবাস লাঘব করার জন্য তখনিই ঠিক করেছিলাম তাঁর পরবর্তী প্রবাসের সময় গাড়ির ব্যবস্থা করার এবং সে ভাবেই করা হয়েছিল, তবে বসন্তদা যে খুব খুশি হয়েছিলে এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় নাই।

ত্রিপুরায় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আট বছর পর আমাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সহ সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তখন অজয়দা, বসন্তদা সহ মিজোরামে আমাদের একটি বিদ্যালয়ে পরিদর্শনের জন্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর থেকে নিজস্ব বাহনে সকাল দশটায় আমাদের যাত্রা প্রারম্ভ হয়। জম্পুই পাহাড়ের চড়াই রাস্তা দিয়ে আমাদের মিজোরাম যাত্রার প্রথম দিন তুইপুই বাড়ি গ্রামে গিয়ে শেষ হলো। এটাই মিজোরাম প্রবেশের প্রথম গ্রাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। পূর্ব সম্পর্কিত বনবাসী চক্‌মা পরিবারে যখন আমাদের পর্দাপণ হলো তখন স্বাভাবিক কারণে ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর ক্লান্ত ছিল। পথিমধ্যে বিশ্রাম বা চা-পানের সুযোগ ছিল না। গ্রামটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও আলো ছিল খুবই কম। চাকমারা বৌদ্ধ মতবাদে বিশ্বাসী, মিজোরা খ্রিস্টান। মিজোরা সরকার পরিচালনা করে। তাই চাক্‌মারা বঞ্চিত। তারা অনেক সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। মিজোরামে আমাদের কাজ চাকমাদের মধ্যে। চা-পানের পর পাশের বাড়িতে আমি ও বসন্তদা ভোজন করতে গেলাম। খুবই কম আলোয় ভাত ডালের সঙ্গে কী কী দেওয়া হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যেহেতু আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা, তাই খাসি বা পাঁঠা কাটা হয়নি। এ জন্য শুঁটকি মাছ রান্না হয়েছে। বসন্তদা আমিষ গ্রহণ করেন না। আমি শুঁটকি খেতে অভ্যস্ত নই। এ কারণে কাঁচা পেয়াজ ও ডাল দিয়ে ভাত খেলাম। গ্রামে একটি বুদ্ধ মন্দির আছে। আমরা সে মন্দির দর্শনের জন্য গেলাম। মন্দিরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভন্তের সঙ্গে বার্তালাপ হলো। মন্দিরে গ্রামের প্রায় সকল পরিবার থেকে লোকজন সমবেত হয়েছেন।

পরের দিন সকালেই আমাদের দ্বিতীয় দিনের প্রবাস প্রারম্ভ হলো। যাত্রা পথ অনেকটা। রাস্তা দুর্গম। ধুলায় ধুসরিত। কোথাও স্থানে জঙ্গল, ছোটো নদী। এসব

পেরিয়ে আমাদের বাহন একটি খুব সাধারণ চায়ের দোকানে থামল। তখন সূর্যদেব একটু পশ্চিম হেলে পড়েছেন। বাহন থেকে নামার পর পরস্পরকে চেনা সহজ হচ্ছিল না। কারণ চোখ জোড়া ছাড়া মুখমণ্ডলের বাকি অংশ ধুলায় আবৃত ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সেদিনের গন্তব্য স্থলে উপনীত হলাম। কাঠের দ্বি-তল গৃহে আমরা ব্যবহৃত কাপড়-জামার ব্যাগ রেখে পার্শ্ববর্তী ছোট নদীতে স্নান সেরে এলাম। রাত্রির আহার সমাধা হলো সকলের। গন্তব্যস্থানে যাবার জন্য তৃতীয় দিন বা শেষ দিনের যাত্রা আরম্ভ ডিঙ্গিতে। তা হলো নদীর জল খুব কম থাকায় ডিঙ্গি চালক ডিঙ্গিটাকে অনেকটা পথ টেনে নিয়ে গেল। নদীটি মরাং নামে পরিচিত। একটি গভীর নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই গভীর নদীটি 'সাজেক'। সাজেকের উপর দিয়ে আমাদের ডিঙ্গিটি প্রায় স্বচ্ছন্দে চলতে থাকল। সাজেক নদী জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে অনেকটা পথ। নদীটির একপাড় বাংলাদেশে অন্য পাড় মিজোরাম তথা ভারতবর্ষ। পাহারার কোনও ব্যবস্থা নেই, নদীর প্রস্থ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিটার। জ্যৈষ্ঠের গরম। শ্রদ্ধেয় বসন্তদা একটি গামছায় মস্তক আবৃত করেছেন। সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ডিঙ্গি থামিয়ে নদীর পাড়ে একটি পাথরে বসে সকলে আহার করে আবার আমাদের বাহনে আরোহণ করলাম। মাঝি ডিঙ্গি সঞ্চালন করার সময় মাঝে মাঝে নদীর জলে অবগাহন করতে থাকে। এক সময় আমারা গন্তব্যে পৌঁছলাম। এ স্থানে নদীর জলস্তর সমতল ভূমি থেকে অনেকটা নীচে। শ্রদ্ধেয় বসন্তদা অনেক চেষ্টায় উঠলেন নদীর উপরের পাড়ে। যে বাড়িতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা সেখানে চা-পানের পরে সকলে রওনা দিলাম আমাদের বিদ্যালয়ে অভিমুখে। বাঁশ নির্মিত বিদ্যালয়ের গৃহে কয়েকটি শ্রেণীকক্ষ। বিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেছে। বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সঙ্গে আমাদের বার্তালাপ হলো। পরবর্তীকালে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হলো এবং কল্যাণ আশ্রমের বিষয় নিয়ে কথা হলো। পরের দিন আমরা একই পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা দিয়েছিলাম।

শ্রদ্ধেয় বসন্তদা শ্রীগুরুজীর নির্দেশিত পথে নিজে পরিচালিত হয়ে আমাদের ইঙ্গিত করেছেন কষ্ট ছাড়া মহান কাজ সম্পন্ন হয় না। শ্রীগুরুজী বলেছেন অত্যধিক দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ ব্যতীত কোনও মহৎ কাজই সম্পাদন করা যায় না। আদর্শের পথে চলার সময়ে কার্যকর্তাকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আনন্দের ক্ষেত্রে বিরাট মূল্য দিতে হবে এবং হাসিমুখে জীবনে বিপদ-আপদকে আলিঙ্গন করতে হবে। কর্তব্যের জীবনের কঠিন যাত্রাপথে শ্রীরামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের ধ্রুবতারা রূপে পথ নির্দেশ করতে পারে। বসন্তদার হৃদয় ছিল মাখনের মতো কোমল, ঋষির মতো সহজ, শিশুর মতো সরল। সর্ব প্রকার কার্যকর্তা তাঁকে আপন ভেবেছেন। সকলের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় বসন্তদা। কার্যকর্তা নির্মাণ, কার্যকর্তার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান, কার্যকর্তা অন্বেষণ এবং উপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত করার ফলে সংগঠনের সাফল্য লাভ, বিষয়গুলি তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলতেন, নিজের প্রতি কঠোর, সহকারী কার্যকর্তার প্রতি নরম ব্যবহার করা আবশ্যক। কার্যকর্তার সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে খবর নিয়ে তার সমাধান করা কর্তব্য। আপ্পাজী নামে একজন বৃদ্ধ কার্যকর্তা ছিলেন। মহারাষ্ট্র থেকে মণিপুরের কাকচিং ছাত্রাবাসের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। মণিপুর থেকে কলকাতা আসার সময় ট্রেনে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়। বসন্তদা এ বিষয় অবগত হয়ে কার্যালয় থেকে নির্গত হলেন, যাবার আগে কার্যালয় প্রমুখকে আপ্পাজীর আহারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। বিকেলে কার্যালয় প্রমুখকে আপ্পাজীর জন্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কেনার অর্থ দিলেন। যার ফলে আপ্পাজী নিশ্চন্ত মনে ফিরতে পেরেছিলেন। একজন বিবাহিত কার্যকতাকে অন্য রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সপরিবারে। দু'মাস পরে বসন্তদা সে রাজ্যে গিয়ে কার্যকর্তার ভাড়া বাড়িতে খোঁজ খবর নিলেন। অবগত হলেন কার্যকর্তার বাড়িতে পাখা নেই। গ্রীষ্মকাল ছিল এবং কার্যকর্তার শিশু সন্তান ছিল, গরমে কষ্ট হবে এজন্য তিনি পাখার ব্যবস্থা করলেন। অপর একজন কার্যকর্তা কয়েক বছর যাবৎ মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। সে কার্যকর্তার বাড়ির আর্থিক স্থিতি ভালো নয়। সে কার্যকর্তার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। বসন্তদা এ বিষয়টি অবগত হয়ে এই কার্যকর্তার বোনের বিয়ের জন্য কিছু অর্থ সহযোগিতা করেছিলেন কল্যাণ আশ্রমের পক্ষে। যদিও অর্থের পরিমাণ যৎসামান্য ছিল। কিন্তু এর ফলে কার্যকর্তার মানসিক শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। এতে কার্যকর্তার মনে সংগঠনের প্রতি দায়িত্ব অধিক বৃদ্ধি হয়েছে তা বলা বাহুল্য। বসন্তদা তাঁর কর্মের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কার্যকর্তার প্রতি আপন ভাব থাকা আবশ্যক।

বসন্তদা বলতেন, কোনও সংগঠনের মতবাদ বা তত্ত্ব, দর্শন যতই মহান হোক না কেন, সেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কার্যকর্তাদের শিক্ষা দীক্ষা, চরিত্র জ্ঞান, ব্যবহার কুশলতা এবং সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা সঠিক না থাকলে সাফল্য আসবে না। বসন্তদা নিজের জীবনকে রাষ্ট্রহীতের মহান কর্মযজ্ঞে সমর্পণ করেছেন। তিনি জীবনে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে উপনীত হয়েছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, যাঁদের শিরার মধ্যে আগুনের কর্মশক্তি, চোখে আদর্শবাদের জ্যোতি, সমস্ত প্রলোভন ও বিপদ আপদের ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও অবিচল ও সুদৃঢ় এবং যাঁরা চতুর্দিকে অনুপ্রেরণা বিচ্ছুরিত করে চলেন। তাঁরা এক সাফল্য থেকে আরেক সাফল্যের দিকে অবিরাম এগিয়ে চলেন— যতক্ষণ না তাঁদের লক্ষ্যে উপনীত হন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস বলেছেন, আমাদের সঙ্গে দেবদুর্লভ কার্যকর্তা আছেন, এজন্য আমাদের সাফল্য হবে। বসন্তদা একজন দেবদুর্লভ কার্যকর্তা ছিলেন। তাঁর জীবন আমাদের কাছে প্রেরণার পাথেয়। ■

পাকিস্তানকে মোদী
আত্মসম্মানের বিনিময়ে শান্তি নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শান্তি আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারত শান্তি বজায় রাখতে চায়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার প্রশ্নেও ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আত্মসম্মান এবং সার্বভৌমত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে ভারত এই কাজ করবে না। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বহুযুগ ধরে লড়াই করে আসছে। এই নীতিতে কোনও পরিবর্তন আসেনি, আসবেও না। কিন্তু দেশ যদি আক্রান্ত হয় তা হলে ভারতীয় বাহিনী চুপ করে বসে থাকবে না। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের মোড়কে যারা এতদিন ছায়াযুদ্ধ চালিয়েছে তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া গেছে।

ভবিষ্যতেও যদি কেউ এই প্রয়াস চালায় তা হলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সরকারের নীতিই হলো, যারাই দেশের শান্তি এবং অগ্রগতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির অভিযোগের যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। পাকিস্তানের মন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, পাকিস্তানের পেশোয়ারের স্কুলে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ভারত। এই অভিযোগ খণ্ডন করে সুষমা স্বরাজ রাষ্ট্রসঙ্ঘে বলেন, 'অভিযোগ উঠেছে আমাদের ষড়যন্ত্রের কারণেই নাকি আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা জানি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে-কোনও সমস্যার সমাধান করা যায়। আমরা বহুবার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি। সেই সব আলোচনা যদি মাঝপথে থমকে যায় তার জন্য দায়ী পাকিস্তান।' সুষমা প্রশ্ন করেন, 'আমাকে দয়া করে বোঝান অবাধ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আলোচনা কীভাবে শুরু করা সম্ভব?'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাক বিদেশমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ : সঙ্ঘ সন্ত্রাসবাদ এবং ফ্যাসিবাদের আঁতুড়ঘর। সঙ্ঘের জন্য ভারতের সংখ্যালঘুরা প্রকাশ্যে নানারকম হেনস্থার শিকার হন। পাক বিদেশমন্ত্রীর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, '১৯৪৭ সালের আগে পৃথিবীতে পাকিস্তান নামে কোনও দেশ ছিল না। সন্তান এবং প্রতিবেশী--- দুটি ভূমিকাতেই পাকিস্তান ব্যর্থ। পাকিস্তান একটা অভিশাপ। রমজান উপলক্ষ্যে ঘোষিত যুদ্ধবিরতিও পাকিস্তান লঙ্ঘন করেছে।... কিন্তু মুশকিল হলো আমাদের দেশে কংগ্রেস-সহ প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল পাকিস্তান নিয়ে মুখ খুলতে ভয় পায়।'

সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে পাকিস্তান আবার বেকায়দায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মুখ তো পুড়েছেই, ভারতের বহুমুখী আক্রমণের সামনে নিজের দেশেও যথেষ্ট কোণঠাসা ইমরান খানের সরকার।

শিক্ষাব্যবস্থা আরও সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন : মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই সৃজনশীল করে তুলতে পারে। শিক্ষার হাতে এমন এক চাবিকাঠি আছে যা নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর করে তোলার প্রেরণা জোগায়। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক লিডারশিপ অন এডুকেশন ফর রিসারজেন্স বিষয়ক একটি আলোচনাসভার উদ্বোধনে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, সামাজিক সমস্যার শিকড়ে পৌঁছতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সৃজনশীল হতে হবে। রিসারজেন্স বা পুনরুত্থান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দেশে সামাজিক পুনরুত্থানের সব থেকে বড়ো উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সারা বিশ্বকে ভারতীয়দের চিন্তনশক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন।' শিক্ষার উপাদান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস, চরিত্র গঠন এবং নানা মানবিক গুণের কথা উল্লেখ করেন। আজকের দিনে উদ্ভাবনী শক্তিও যে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উপাদান তাও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া আমরা সমাজ, রাষ্ট্র— এমনকী একটি সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিজীবনের কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষাই কী সব? প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা নালন্দা বিক্রমশীলার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশেও সমান নজর দেওয়া হতো। এই প্রসঙ্গে ভারতের পরম্পরাগত শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধনে যুগান্তকারী অবদানের জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকর, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ড. রামমনোহর লোহিয়াকে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বস্তিকার পুজোসংখ্যা প্রকাশ ও লেখক সম্মেলন

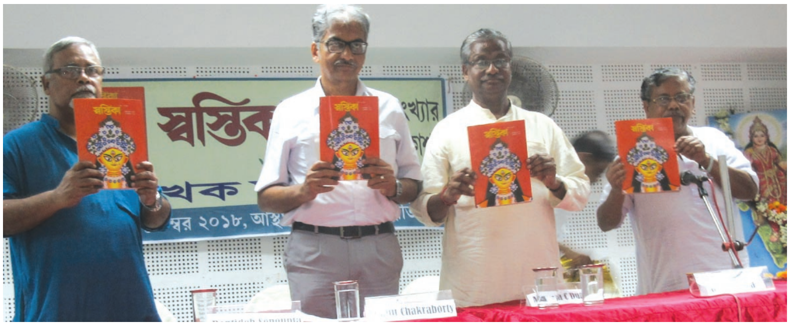

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৯ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো 'স্বস্তিকা' পত্রিকার ১৪২৫ বর্ষের পুজোসংখ্যা। সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী। তিনি এদিনের অনুষ্ঠান লেখক সম্মেলনে সভাপতির আসনও গ্রহণ করেন। অভিজিৎবাবু তাঁর বক্তব্যে স্বস্তিকার প্রচার প্রসারে জোর দেন। তিনি বলেন— 'আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা কমিউনিস্ট 'মাইন্ডসেট' কাজ করে। আমরা আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, ঘরের পাশে কাশ্মীরে হিন্দু-নিধনে ততটাই মৌন হয়ে যাই।' তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তাই জাতীয় ভাবধারা আনতে স্বস্তিকা পত্রিকার অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরেন তিনি। বিশেষ অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র ভাবনা আনার ক্ষেত্রে স্বস্তিকার লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তাঁর মন্তব্য— 'দেশের বিরুদ্ধবাদী শক্তির সঙ্গে আমাদের অনবরত লড়াই করতে হচ্ছে। একাজে স্বস্তিকার লেখকগোষ্ঠী সুদৃঢ় ভূমিকা নিচ্ছেন।'

অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা পুজো সংখ্যার সবিশেষ পর্যালোচনা করেন সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। তিনি পত্রিকার প্রতিটি রচনা বিশ্লেষণ করে মননশীল রচনা পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য লেখকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বাগত ভাষণে পত্রিকার উপদেষ্টা বিজয় আঢ্য স্বস্তিকার সংগ্রামময় অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা বজায় রাখতে পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর কাছে আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দে মাতরম্ পরিবেশন করেন ভরত কুণ্ডু। পরিচালনায় ছিলেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য, অভিজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

পাটচাষি ও চটশ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিই সরকারের কাম্য : স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাটচাষি ও পাট চাষে নিযুক্ত শ্রমিকদের সব রকমের পাওনাগণ্ডা হিসেব মতো মেটাতে পারলে তবেই কেন্দ্রের তরফ থেকে চটকলগুলির তৈরি সামগ্রী ক্রয় বাবদ দেয় টাকা দেওয়া হবে। এই মর্মে কলকাতায় বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। চটের বস্তা বাবদ মিলগুলির বছরে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার চালু অর্ডার সবসময় থাকে। সরকারের তরফে দেশের পাটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতেই এত বড় অঙ্কের স্থায়ী বরাত দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে চাষি ও চট শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিই সরকারের কাম্য। ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের ডাকা এক সভায় এই মন্তব্য করেন শ্রীমতী ইরানি। এই সূত্রে ইরানি প্রায়শই পাটচাষি ও শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা না পাওয়ার অভিযোগ পান বলে জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মিল মালিকরা সরকারের তরফ থেকে চুলচেরা বকেয়া টাকা সঠিক সময়ে পেয়ে যান। এর পরেও যদি তারা চাষিদের পাওনা না মেটায় বা দায়িত্ব এড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে সরকার বরাত দেওয়াই বন্ধ করবে। এই সূত্রে মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এ জি এম) ইরানি বলেন সরকার দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষাকবচ দিতে শিগগিরই জামাকাপড়ের ওপর আমদানি শুল্ক বাড়াতে চলেছে। তিনি বলেন, ছোট মাপের বস্ত্র কারখানাগুলি সরকারি মদতে অচিরেই মধ্য মাপের কারখানায় রূপান্তরিত করার ওপর জোর দিতে হবে।

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র রেখে গেলেন যুগান্তকারী সব রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৩ মাস প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলানোর পর ২ অক্টোবর গান্ধী-জয়ন্তীর দিন তিনি নির্ধারিত মেয়াদ শেষ করলেন। প্রাক-অবসর সপ্তাহটিতেও প্রধান বিচারপতির অধীনস্থ বেঞ্চগুলিতে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ সব মামলার চূড়ান্ত ফয়সালার অপেক্ষমান লাইন যা বিচিত্র সব সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

(১) বহু ক্ষেত্রে আধারের প্রয়োজনীয়তাকে ছেঁটে দেওয়া, তাকে বাধ্যতামূলক না রাখা যেমন ব্যাঙ্ক খাতা খোলা বা মোবাইল সংযোগ।

(২) বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে অপরাধমূলক আচরণের পরিধি থেকে বার করা।

(৩) সমকামিতার ক্ষেত্রে কোনো রকম অপরাধমূলক ধারা প্রয়োগ না করে সমলিঙ্গ যৌনতার সমর্থক মানুষদের পূর্ণ অধিকার

দেওয়া। এই রায়ের ফলে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা আইনি ও সংবিধানগত সব রকমের রক্ষাকবচের অধিকারী হতে পারবে।

এই বড় ধরনের রায়গুলি ছাড়াও আরও বেশ কিছু এমন রায় দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রধান বিচারপতি ও তাঁর অধীনস্থ বেঞ্চ সম্পর্কে নাগরিক মনে দীর্ঘস্থায়ী চিন্তাভাবনার অবকাশ থাকবে। যেমন, ১৯৯৩-এ মুম্বইয়ের সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণের ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত টাইগার মেমনের ভাই ইয়াকুব রাজ্জাক মেমনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখা। এই সূত্রে প্রধানবিচারপতি মেমনের আইনজীবীকে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মধ্য রাত্রে শুরু হয়ে ফাঁসির দিন সকাল অবধি শুনানি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। শুনানির পরই ফাঁসির দড়ি প্রস্তুত হয়। প্রসঙ্গত, এই আদেশের পরেই শ্রী মিশ্রের নিরাপত্তা Z + 1 পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

নির্ভয়া কাণ্ড ও মৃত্যু মামলায় নির্মম চার আসামির মৃত্যুদণ্ড মকুব করার আবেদন তিনি ও তাঁর বেঞ্চ নির্দ্বিধায় নাকচ করে দেন। উত্তর প্রদেশের প্রভাবশালী রাজনীতিক ডিপি যাদবের পুত্র বিকাশ যাদবের নীতীশ কাটারা হত্যা মামলায় ২৫ বছরের জেলের আদেশও তিনি বহাল রাখেন। একটি জনস্বার্থ মামলায় আবেদন ছিল— ফাঁসির ক্ষেত্রে আসামির যে যন্ত্রণা ভোগের পর মৃত্যু হয় তা লাঘব করতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার। শ্রী মিশ্র বিষয়টি সংসদে বিবেচনা করে মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম যন্ত্রণা এড়ানোর কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Passive Enthansia সূত্রে তাঁর রায়। মারণ রোগাক্রান্ত মানুষ চাইলে তার অন্তিম ইচ্ছাপত্র সই করার পর যদি বাঁচার সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে লাইফ সার্পোট ব্যবস্থার সাহায্য তিনি নাও নিতে পারেন। মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে তাদের সমানাধিকারের লড়াইয়ে প্রধান বিচারপতির রায়গুলি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। খুঁটিনাটি ক্ষেত্র যেমন মেয়েদের অবস্থা সাপেক্ষে ২০ সপ্তাহের বিপদসীমা পেরিয়ে গেলেও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রসবকালীন আইন মেনে অস্ত্রপ্রচার করা যাবে। আর বিজেপি ও আপ দু' দলই তাঁকে চিরস্থায়ী আসন দেবে দিল্লির প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে দু'দলকেই সন্তোষজনক রায় দেওয়ায়।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ট্রেনে বই বিক্রি ভাই দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সেদিন একটু সকাল সকাল বাড়ি থেকে স্টেশনে এসেছিলেন হুগলীর তরুণ ছড়াকার ভাই দাস। কাঁধের ঝোলায় অন্যদিনের তুলনায় কিছু বেশি বই ভরে নিয়েছিলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। তাই ভাই দাসের আশা ছিল যদি মোদীজীর নামে কিছু বই বেশি কাটে। তার আশা কিন্তু সেদিন বিফলে গেল না। সূর্য পশ্চিমে গড়ানোর আগেই তার ঝোলা একেবারে ফাঁকা। চলন্ত ট্রেনে একরকম হটকেকের মতোই। ২০ পৃষ্ঠার ৫ টাকা দামের নিজের লেখা চটি বই 'উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদী'।

ভাই দাশ চাকরি না পেয়ে নিজের লেখা বিভিন্ন ধরনের ছড়ার বই, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের জীবনী সংবলিত বই লিখে কোনও প্রকাশকের কাছে ছেপে নিয়ে কমিশনে ট্রেনে, বাসে বা বিভিন্ন সভাসমিতিতে বিক্রি করেন। এলাকায় এবং ট্রেনে, বাসে সবাই ভাই দাসকে ছড়াকার নামেই ডাকে। এভাবেই বই বিক্রি করে বিধবা মা ও এক সন্তানের ভরণপোষণ করে চলেছেন প্রায় ২০ বছর ধরে। ভাই দাস জানান, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নন, যখন যে বিষয় ভালো চলে সেরকম বই তৈরি করে বিক্রি করেন। আর তাতেই তিনজনের সংসার কোনও ভাবে চলে যায়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

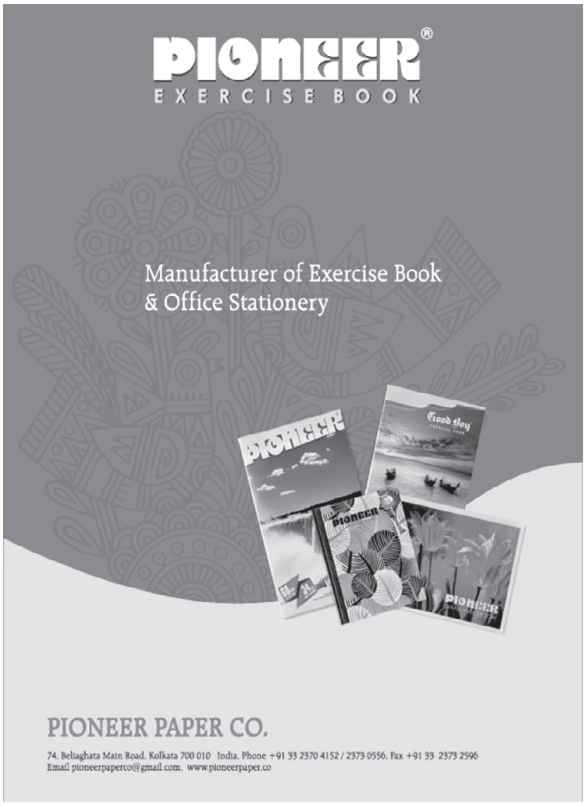

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

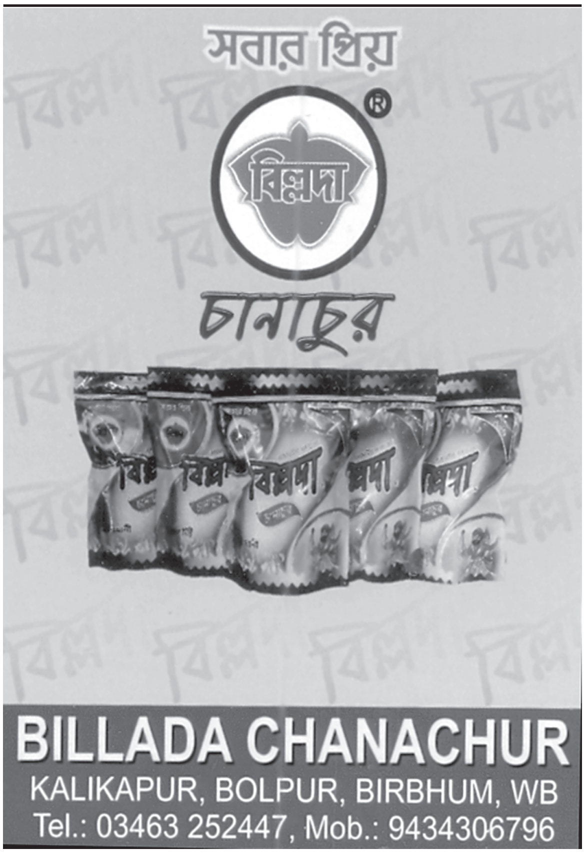

সাপ্তাহিক রাশিফল

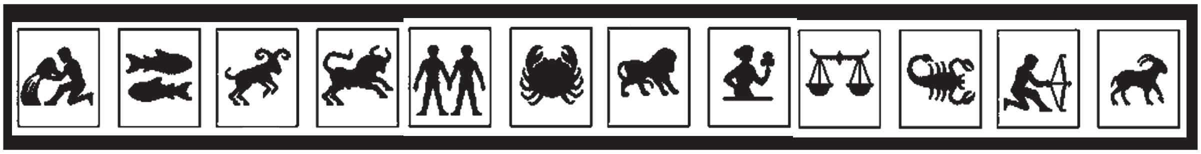

৮ অক্টোবর (সোমবার) থেকে ১৪ অক্টোবর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, কন্যায় রবি, তুলায় বুধ,বৃহস্পতি-বক্রী শুক্র, ধনুতে শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। বৃহস্পতিবার রাত্রি ১-০৫ মিনিটে বৃহস্পতির বৃশ্চিকে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কন্যায় উত্তরফাল্গুনী থেকে বৃশ্চিকে বিশাখা নক্ষত্রে।

মেষ : শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক। শ্রীযুক্ত কান্তিমান, গৃহসুখ, জ্ঞানের উন্মেষ, বিলাসব্যসনে প্রভূত ব্যয়। প্রতিবেশীর সাহচর্যে তৃপ্তি, কবিত্ববোধ। সপ্তাহের শেষভাগে শত্রুতা, সমালোচনা, মানসিক চঞ্চলতা। সন্তানের অসামাজিক প্রবণতা বৃদ্ধি— যা উদ্বেগের।

বৃষ : ধর্ম-কর্মে মনোবাঞ্ছা পূরণ। ব্যবসা ও বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ। অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ। বাহন ও বাড়ির যোগ, কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্বে দক্ষতা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংশা প্রাপ্তি। সপ্তাহের শেষদিকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, আড়ষ্টতা ও হতাশা।

মিথুন : মানসিক দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। যুক্তিজালে শত্রুতা হ্রাস। পরিজন প্রিয়। শিল্প ও সৌন্দর্য্যের পূজারী। লাইফ পার্টনারের পদোন্নতি ও কর্মে সুখ্যাতিলাভ। উচ্চাভিলাষীর ছল-চাতুরি বিষয়ে সতর্ক ও বাক্‌সংযমী হওয়া প্রয়োজন। ভ্রমণ বাতিলে মনোকষ্ট।

কর্কট : বিদ্বান, পুত্রবান, লোকমান্য, বন্ধুপ্রিয়, শত্রুঘ্ন— পরিচিত মহলে সাধুবাদ প্রাপ্তি। সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রকাশ। ভ্রাতা-ভগ্নী ও স্বজন বাৎসল্যে আনন্দঘন পরিবেশ। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গলাভ। ব্যক্তিত্বের কাছে অভিসন্ধির পরাজয়। স্ত্রীর শরীরের যত্নের প্রয়োজন।

সিংহ : রমণীর বুদ্ধিমত্তায় বহুদিনের ইচ্ছাপূরণ, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি। শরীরের মধ্যভাগে অস্ত্রোপচার যোগ। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি। ক্রীড়াবিদ, পুলিশ, মিলিটারি ও শল্যচিকিৎসকের কারিগরি কুশলতা বৃদ্ধি, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার আশাপ্রদ নয়।

কন্যা : মহৎ ব্যক্তি দ্বারা উপকার অথবা উপার্জনের বিকল্প পন্থার সন্ধান লাভ। মানসিক দুশ্চিন্তায় হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে সতর্ক থাকুন। বেকারত্বের অবসানের স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। প্রেমের হাতছানিতে সহানুভূতিশীলতার অভাব। সময়ের অপচয়, অবসাদ।

তুলা : ভ্রাতা ও ভগ্নীর জ্ঞান ও বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি। পিতার বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যহানি। লাইফ পার্টনারের রহস্যজনক কাজে প্রবণতা ও অপাত্রে দান। গৃহের সদস্য বৃদ্ধির যোগ। সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা, উদ্বেগ, বিড়ম্বনা। উর্ধাঙ্গের চোট-আঘাত, সমালোচনা ও অপবাদ।

বৃশ্চিক : মাতার স্বাস্থ্যহানি। সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। নিকটজনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। আর্থিক লেনদেন বিষয়ে কারও প্ররোচনায় পড়তে পারেন। একাধিক উপায়ে অর্থাগম ঘটনো ও ব্যয় বাহুল্যের চাপে বিব্রত হবেন। হার্ট, চর্ম ও প্রেসার রোগীদের সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু : পেশাগত কর্মে জটিলতা, যোগ্যতার ঘাটতি না থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আচরণ হতোদ্যমের কারণ। আর্থিক লেনদেন ও সম্পত্তি বিষয়ক লিখিত চুক্তিতে বিরত থাকা শ্রেয়। যুবক বন্ধু থেকে সতর্ক থাকুন। বাতজ বেদনা ও রক্তচাপ বৃদ্ধি যোগ।

মকর : আর্থিক ও মান-সম্মানের ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না। চিন্তা করে কাজ করুন। পাবলিক রিলেশনে ব্যাপৃত থাবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দূরগমন। সন্তানের সৃষ্টিশীল কর্মে উদ্দীপনা। সপরিবারে ভ্রমণ।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পড়ে থাকা কাজ ও পারিপার্শ্বিক সমস্যায় মানসিক চাপ। বকেয়া পাওনার প্রাপ্তি সামান্য কারণে হাতছাড়া হবার যোগ। অগ্রজের আর্থিক শুভ। আধুনিকতার পরশে বিদ্যার্থীর চঞ্চল মানসিকতা। সপ্তাহের শেষদিকে নিজ যোগ্যতার বাস্তবায়ন।

মীন : ন্যায়, সরলতা, সংবেদনশীলতায় বহুমুখী প্রতিভার স্ফূরণ, সুধীজনের সান্নিধ্য ও শংসা প্রাপ্তি। পারিবারিক সুস্থিতি শান্তির বেলাভূমিকে প্লাবিত করবে। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত মন। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত, সংক্রামক রোগে সতর্কতা আবশ্যক।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য